পড়তে ভালোবাসি

ড. রাগিব সারজানি

ড. রাগিব সারজানি

পড়তে ভালোবাসি

অনুবাদ
শামীম আহমাদ

সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা

মাকতাবাতুল হাসান

সভ্যতার সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত যেসকল বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছে–
তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হলো
পড়ার প্রতি তার অনুপ্রেরণা।
–ড. ত্বহা হোসাইন

অ র্প ণ

মাওলানা আবু দাউদ–

যার কথা ভাবতেই ঝলমল করে ওঠে অতীত। আল্লাহর জন্য এত বিনয়!
ছাত্রদের জন্য এত মমতা! এ যুগে সত্যিই বিরল!
তাঁর দীর্ঘ নেক হায়াতের প্রত্যাশায়...

বিষয় **পৃষ্ঠা**

পড়াকে ভালোবাসতে শেখার পদ্ধতি

কী পড়ব?

‘পড়া’ নিয়ে কিছুকথা

সৈয়দ মুজতবা আলী দিয়ে শুরু করা যাক–

‘এক ড্রইংরুম-বিহারিণী ভদ্র মহিলা [নিশ্চিত বাঙালিনি] গিয়েছেন বাজারে, স্বামীর জন্মদিনের জন্য উপহার কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনি ধনীর [উভয়ার্থে] কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তার স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললেন, “তবে একখানা ভালো বই দিলে হয় না?”

গরবিনি ভদ্র মহিলা নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, “সে-ও তো ওঁর একখানা রয়েছে।”’

অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষের কথা থাক– আমাদের দেশে বহু শিক্ষিত মানুষের ব্যাপারটা আসলেই কি এমন নয়? শো হিসেবে একটা কিংবা দুটো বইয়ে জীবন পার। অনেকের অবস্থা তো এর চাইতেও ভয়াবহ। বহু বহু ডিগ্রিধারী নাক উঁচু শিক্ষিত জনাবদের বাড়ি-বাসা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হয়তো পড়ার মতো একটা বই পাওয়া যাবে না। অ্যাকাডেমিক বইয়ের কথা আলাদা। অনেকে অবশ্য শিক্ষাজীবনের সমাপ্তির পর বস্তা ভরে তা-ও স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়।

অথচ একজন মুসলমান– যার জীবনবিধানের প্রথম আদেশ ‘পড়ো’, তার পড়াশোনার, জানাশোনার ব্যাপ্তি হওয়ার কথা ছিল কত ব্যাপক ও বিস্তৃত। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা ছিল সকল জাতিকে। একদিন ছাড়িয়েছিলও। কিন্তু যখন থেকে এ জাতি পড়াশোনা ও জানাশোনা ত্যাগ করেছে, তখন থেকেই নিজের আত্মশক্তি হারিয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়েছে।

একবার আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাই–

১৯২৯ সাল।

বিশ্বব্যাপী আলোচিত নওমুসলিম মুহাম্মদ আসাদ বলেন, ‘মদিনার এক কুতুবখানা। কালের অনেক ঝড়ঝাপটা উজিয়ে এখনো ইসলামের যত কিতাব রক্ষিত হয়ে আছে, সেগুলোর দিকে তাকালেও কত বিস্ময় জাগে! কী তার বিশালতা! আগের কত শ্রম ও সাধনা! আর এখন... আমি বিভিন্ন জিনিস ভাবতে থাকি। আমার কল্পনায় ভেসে ওঠে অতীত ও অতীতের ইলমি সাধনা।

আমি তন্ময় হয়ে কিতাবগুলো দেখতে থাকি। এ সময় প্রাজ্ঞ শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইহিদ আমার অগোচরে বলে উঠলেন, ‘তোমাকে কী যেন পীড়া দিচ্ছে বেটা। তোমার মুখে এই তিক্ততার ছাপ কেন, বলো তো?’

আমি আগে থেকে তাকে দেখতে পাইনি। তাঁর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে আমি তাঁর দিকে তাকাই। এরপর কিতাবগুলোর দিকে ইশারা করে বলি, 'শায়খ, আমি ভাবছিলাম, আমরা মুসলমানরা কত দূরে চলে গেছি এগুলো থেকে। আমাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা আর অধঃপতনের দিকে।'

'হ্যাঁ বেটা, একদিন আমরা মহান ছিলাম। ইসলামের শিক্ষা আমাদের বড় করেছিল। আমরা ছিলাম একটি পয়গামের বাহক। যতদিন আমরা সেই পয়গামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম, ততদিন আমাদের হৃদয় ছিল উদ্দীপিত এবং অনুপ্রাণিত আর আমাদের মন-মানস ছিল আলোকিত এবং উদ্ভাসিত। কিন্তু যেই আমরা ভুলে গেলাম, কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমাদের মনোনীত করেছেন, তখনই ঘটল আমাদের পতন।'

এরপর তিনি বই-ভাণ্ডারের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আমরা অনেক দূরে চলে গেছি এগুলো থেকে– অনেক দূরে।'

আরেকটা ঘটনা বলি–

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখায় সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী বিখ্যাত জ্ঞানতাপস আল-বেরুনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এ সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এক বিজ্ঞানী বন্ধু এলেন। আল-বেরুনি সে অবস্থায় তাঁর বন্ধুকে গণিত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসলেন।

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও এমন জ্ঞান অন্বেষণ! আল-বেরুনির বন্ধুটি খুবই আশ্চর্য হলেন। বন্ধুটি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, তুমি কিনা এ অবস্থায়ও নতুন কিছু জানতে প্রশ্ন করছো!

আল-বেরুনি বললেন, 'আমার জন্য কি এটাই বাঞ্ছনীয় নয় যে, একটা প্রশ্নের সমাধান জেনে নিয়েই মৃত্যুর সুধা পান করব? এটা কি না-জেনে ইহধাম ত্যাগ করার চাইতে উত্তম নয়?'

বন্ধুকে বিদায় দেওয়ার অব্যবহিত পরেই আল-বেরুনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর ঘটনা তো আমরা সকলেই জানি। তিনিও মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আরেকটু জানতে চেয়েছেন। মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমাদের অতীতের সোনালি ইতিহাস আকীর্ণ হয়ে আছে এমন হাজারো হিরক-ঘটনায়। জ্ঞানের জন্য জীবনোৎসর্গের সেই ইতিহাস আমরা আবার ফিরিয়ে আনতে চাই। আমরা ঘুরে দাঁড়াতে চাই। পড়া... জীবনভর পড়তে থাকা, জানতে থাকার কোনো বিকল্প নেই। চাই ব্যাপক পড়াশোনা ও জানাশোনা...

চাই ব্যাপক গবেষণা ও পরিচর্চা...
নিজেদের দীন সম্পর্কে...
দীনের আকিদা, ফিকহ এবং মানহাজ সম্পর্কে...
প্রিয়নবি এবং তার সাহাবিদের সম্পর্কে...
ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি সম্পর্কে...
হকপন্থী দল এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের জামাআত সম্পর্কে...
মডার্নিজম থেকে শুরু করে সকল বাতিল মতবাদ-মতাদর্শ সম্পর্কে...
কুফরি তন্ত্র-মন্ত্র এবং ইসলামের নামে ছড়িয়ে পড়া সকল জালিয়াতি সম্পর্কে...
বর্তমানের পৃথিবী সম্পর্কে...
ভবিষ্যতের আখিরাত সম্পর্কে...

এবার বক্ষ্যমাণ বইটি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার– বইটির লেখক ড. রাগিব সারজানি। মিশরীয় লেখক। বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারক। গবেষক। ইতিহাসবিদ। পেশায় চিকিৎসক। বাংলা ভাষায় তাঁর কয়েকটা বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যে বাঙালি পাঠকমহলেও তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই বইটির নাম– القراءة منهج حياة। বইটিতে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে– অথচ অতি চমৎকারভাবে পড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন। এরপর পড়াকে জীবনভর চালিয়ে নেওয়ার সুন্দর দশটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। শেষে বর্ণনা করেছেন দশটি পাঠ্য-বিষয় সম্পর্কে।

বইটা যখন আমার হাতে আসে– পড়তে থাকি। অনুবাদের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু পড়তে পড়তে এমন অনেক কথা, বিষয় ও পদ্ধতির খবর পেলাম, যা ছিল খুবই উপকারী এবং অতি প্রয়োজনীয়। আগে থেকে এগুলো জানতে পারলে এবং পাশাপাশি জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে কতই না ভালো হতো! কিন্তু আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। ভাবলাম, হয়তো অন্যদের, নবীনদের... তরুণদের এ সকল পরামর্শ-দিকনির্দেশনা কাজে আসবে। এতে করে তাদের অনেক সময় ও শ্রম অযথা নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বার্তাগুলো তাদের সহযোগিতা করবে জীবনকে সুন্দর ও সফলভাবে গড়ে তুলতে... জ্ঞানের সুধাময় সরোবরে অবগাহন করতে।
এ কারণেই অনুবাদে হাত দেওয়া।
অবশেষে আমাদের মুজতবা আলীর আরেকটা 'রম্য' দিয়ে লেখাটা শেষ করি–
'এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাকে খুন করেন। হেকিম মারা গেলেন। বইটি রাজার হস্তগত হলো। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। একের পর এক পৃষ্ঠা পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু পাতায়

পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে রাজাকে বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোতে হচ্ছে।

এদিকে হেকিম সাহেব আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও তিনি করে গিয়েছিলেন। বইয়ের পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। থুতু দিয়ে পৃষ্ঠা ছাড়াতে গিয়ে রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে...।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।
বই সমাপ্ত।
রাজাও গত।'
বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য-অনীহা দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।'
কিন্তু মুজতবার কাছে আমার প্রশ্ন– যে বাঙালি বই পড়ে না, সে বাঙালি গল্পটা জানবেই বা কী করে!

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠক– আল্লাহ আমাদের সকলের ইহকাল এবং পরকাল সুন্দর করুন।

শামীম আহমাদ
মিরপুর, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জীবনের জন্য পড়া

অনেক সময় আমরা কিছু মানুষকে প্রশ্ন করতে দেখি– আপনার জীবনের শখ কী? কিংবা আপনার প্রিয় বস্তু কী?

এই প্রশ্নের উত্তর একেকজন একেকভাবে দেয়। একজনের উত্তরের সঙ্গে অন্যজনের উত্তর মেলে না। প্রশ্ন একটাই; কিন্তু এর উত্তরে দেখা যায় প্রচুর ভিন্নতা। কেউ উত্তর দেন, আমার শখ হলো সাঁতার কাটা। কেউ-বা বলেন, আমার শখ হলো বড়শি ফেলে মাছ শিকার করা। এর মাঝে আরেকজন বলে ওঠেন, আমার শখ হলো দর্শনীয় স্থানগুলোতে ভ্রমণ করা।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ শখের কথা বলছেন। সবচেয়ে প্রিয় বস্তুর বর্ণনা দিচ্ছেন। কিন্তু একজনের উত্তরের সঙ্গে অন্যজনের উত্তরের মিল নেই। পাশাপাশি বসা দুজন মানুষের শখের মধ্যেও বহুত তফাত। একেক জনের শখ একেক রকম। আচ্ছা, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার শখ কী'; আর সে উত্তরে বলে বসে, আমার শখ হলো 'বই পড়া', তখন বিষয়টা কেমন হবে?

তবে বিষয়টা যেমনই হোক, ঠিক এ উত্তরটাই অনেক সময় কারও কারও মুখ থেকে শুনতে হয়।

এটাই হলো সমস্যা। কোনো মানুষ যখন নিজের সম্পর্কে বলে– আমার শখ হলো 'পড়া'– কথাটি আমার কাছে খুবই অসামঞ্জস্য মনে হয়। কানের অনুভবে অমসৃণ লাগে।

আচ্ছা বলো– কেউ কি কখনো বলে, আমার শখ হলো 'পানি পান করা'!

সকল মানুষই পানি পান করে। করতে হয়। এ তো মানুষের আবশ্যিক প্রয়োজনীয় কাজগুলোর একটি। এ তো তার জীবনধারণের জন্য, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনিবার্য এক কাজ। আর অনিবার্য কাজ কখনো শখের হয় না।

একইভাবে কেউ বলে না– আমার শখ হলো 'আহার করা'।

কেন? কেন এটা বলা যায় না কিংবা কেউ বলে না? কারণ 'আহার করা'টা মানুষের জীবনের জন্য আবশ্যিক একটি কর্ম; কারও শখের বিষয় নয়। কারণ, মানুষমাত্রই ক্ষুধার্ত হয়; খাওয়া ছাড়া তার জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে খেতেই হয়।

হ্যাঁ, বিভিন্ন খাবারের মধ্যে কোনো বিশেষ খাবার তোমার একটু বেশি প্রিয় হতে পারে। হতে পারে একটু বেশি পছন্দের। পরিবেশ ও রুচির ভিন্নতার কারণে এমনটা হতেই পারে, যেমন অন্য অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই মানুষের এমনটা হয়।

কিন্তু তুমি যদি খাবার খাওয়া ছেড়ে দাও, পানি পান না করো, ঘুমকে একেবারে বর্জন করো এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করো তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে। কারণ, এ বিষয়গুলো প্রতিটি মানুষের জন্য আবশ্যক, জীবনধারণের অনিবার্য উপাদান।

আর ঠিক একইভাবে প্রতিটি মানুষের জন্য 'পড়া'কেও আমি একটি অপরিহার্য বিষয় মনে করি। মনে করি, পড়া জীবনধারণের অপরিহার্য কর্ম বা উপাদান।
এই অপরিহার্য পাঠ বলতে তুমি যে শুধু একটা কি দুটো বই পড়বে– এমন নয়। কিংবা হিসাব করে সপ্তাহে একদিন অথবা বছরে একমাস পড়লেই যথেষ্ট হবে– এমনও নয়। বরং 'পড়া'কে বানাতে হবে তোমার জীবনের পথ ও পাথেয়। 'পড়া'কে মনে করতে হবে জীবনধারণের অপরিহার্য উপাদান– খাদ্য ও অক্সিজেনের মতো।

'পড়া' ব্যতীত তোমার একটি দিনও যেন অতিবাহিত না হয়। পড়বে প্রতিদিন। শিখবে প্রতিদিন। তবে এই 'পড়া' বলতে আবার যেমন তেমন কিংবা যেটা-সেটা পড়া উদ্দেশ্য নয়। তোমার পড়া হবে এমন বিষয়ে– যা হবে উপকারী ও প্রয়োজনীয়।
যে পড়া জীবনকে গড়ে; ধ্বংস করে না।
যে পড়া জীবনকে পরিশুদ্ধ করে; নষ্ট করে না।

হে বন্ধু! তাই তো বলি, 'পড়া' কোনো মানুষের নিছক বিলাসমাখা শখ হতে পারে না। পড়া হবে জীবনযাপনের অনিবার্য উপাদান। 'পড়া' হবে একজন মানুষের পথ ও পাথেয়। এরপরও আমরা কখনো কখনো কারও থেকে খুবই অসঙ্গতভাবে শুনতে পাই– আমি পড়তে ভালোবাসি না... কিংবা আমি পড়তে অভ্যস্ত নই... অথবা একটু পড়তে বসলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, ঘুমে ধরে...।

তাহলে তো এটা এমন কথা হলো– কেউ বলল, খেতে আমার খুব ক্লান্তি লাগে; তাই আমি খাব না। পান করতে আমার কষ্ট হয়; তাই আমি আর পান করব না...।

কত আজগুবি ও কিম্ভূতকিমাকারই না মনে হবে এই কথাগুলো! পড়ার ব্যাপারটাও ঠিক এমনই।
পড়া ছাড়া কীভাবে জীবন চলতে পারে! পড়া ছাড়া কীভাবে পূর্ণতা পেতে পারে যাপিত জীবন!

সিরাত থেকে প্রথম শিক্ষা

তুমি যদি সিরাতের দিকে, প্রিয় নবির জীবনচরিতের দিকে একটু দৃষ্টি দাও, তবে দেখতে পাবে, পড়ার ব্যাপারে সেখানে কতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেখতে পাবে– ওহির সূচনাকাল থেকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো তেইশ বছরের আদর্শ জীবনীতে পড়ার বিষয়টা কতটা যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে চর্চিত হয়েছে। সেগুলোর সামান্য অনুধাবনও যদি তোমার হয়– আর আমি যদি বলি, 'পড়া' কখনো কোনো মানুষের নিছক শখ হতে পারে না, পড়া হবে মানব জীবনের অনিবার্য পথ ও পাথেয়– তবে আর তুমি আমার এই কথাকে অসঙ্গত বা বাড়াবাড়ি মনে করবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর জিবরিল আলাইহিস সালামের প্রথম ওহি নাজিলের বিষয়টি নিয়েই একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখো না! যে 'اقْرَأْ' [পড়ো] শব্দের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে, এই মহান শব্দটি কি আমাদের কোনো ভাবনা ও চিন্তা-রহস্যের দিকে তাড়িত করে না? কেন ওহির সূচনা হলো এই 'পড়ো' শব্দের মাধ্যমে?

সম্ভব তো ছিল– এই শব্দটি ছাড়া ওহি অন্য কোনো শব্দ দিয়ে ওহির ধারাপাত হবে। এতদসত্ত্বেও এই কোরআন– যা দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অবতীর্ণ হবে– শুরু হলো মহান এই শব্দ 'اقْرَأْ' দ্বারা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন একজন উম্মি মানুষ– যিনি পড়তে জানেন না, অথচ তাঁরই ওপর ওহি অবতরণের ধারাপাত হলো 'اقْرَأْ' [পড়ো] শব্দ দ্বারা। শব্দটি এমন একজন ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে– যিনি বিলকুল পড়তেই জানেন না– তাকেই কিনা বলা হচ্ছে 'পড়ো'। অথচ আমরা জানি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিরক্ষরতার বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য হাজারো প্রশংসনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কোরআনুল কারিম সেসবের কোনো একটি আদেশ বা আলোচনা নিয়ে সূচিত হতে পারত; কিন্তু তা হয়নি। আল্লাহর সর্বশেষ নবিকে সম্বোধন করে ওহির সূচনা হলো খুবই সংক্ষিপ্ত একটি শব্দে, স্পষ্ট আদেশ ও নির্দেশের মাধ্যমে– যার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই 'اقْرَأْ' হবে মুসলিম উম্মাহর পথ ও পাথেয়। হবে জীবনযাপনের প্রধানতম অবলম্বন।

তাই তো ওহির সূচনা হলো 'اقْرَأْ' শব্দ দিয়ে। কত গভীর অর্থময় ও তাৎপর্যপূর্ণ এই শব্দ!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেওয়া হলো তুমি 'পড়ো'। অথচ তিনি জানেন না– কীভাবে পড়বেন এবং এটাও জানেন না– কী পড়বেন। সঙ্গত কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামের প্রতিউত্তরে স্পষ্টভাবে বললেন– 'আমি পড়তে পারি না'।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এটা বলাই বোধ হয় যথেষ্ট হয়ে যাবে আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে জিবরিল আলাইহিস সালাম হয়তো অন্য কোনো বিষয়ে কথা শুরু করবেন কিংবা তাকে পড়তে বলার দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেবেন– তিনি আসলে কী চান?

কিন্তু জিবরিল আলাইহিস সালাম সজোরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। এতে আল্লাহর নবি প্রচুর কষ্ট অনুভব করলেন। এরপর জিবরিল আলাইহিস সালাম পুনরায় সেই সংক্ষিপ্ত আদেশটি দিলেন–اقرأ- পড়ো।

এই অবস্থাতেও জিবরাইল আলাইহিস সালাম এই اقرأ শব্দটির অতিরিক্ত একটি কথাও বৃদ্ধি করলেন না। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন না এর দ্বারা তিনি কী চান? কী তাঁর উদ্দেশ্য? এমনকি তিনি এটাও জানেন না– আগমনকারী এই সত্তা কে? কীভাবেই বা তাঁর এই নির্জন গুহায় প্রবেশ করলেন তিনি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনে শুধু আরব্য বেশধারী এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছেন– যিনি নিজের কোনো পরিচয় বা উদ্দেশ্য বর্ণনা না করে বারবার শুধু তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন– اقرأ- পড়ো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বারও বললেন, 'আমি পড়তে পারি না'।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম আবারও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সজোরে বুকে চেপে ধরলেন। তিনি এবারও প্রচুর কষ্ট অনুভব করলেন।

এরপর জিবরিল আলাইহিস সালাম তাঁকে তৃতীয়বারের জন্য বললেন, اقرأ- পড়ো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও বললেন, 'আমি পড়তে পারি না'।

জিবরিল আলাইহিস সালাম আবারও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাপ দিয়ে ধরলেন এবং বলতে শুরু করলেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

১. পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। ২. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক (জোঁকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু) থেকে। ৩. পড়ো এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। ৪. যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, ৫. মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

[সুরা আলাক : কোরআনের প্রথম নাজিলকৃত সুরা]

এতক্ষণ যা কিছু হলো এবং বলা হলো– সবকিছুই ঘটল কোনো ধরনের পরিচয়-পরিচিতি ছাড়া; জিবরিল আলাইহিস সালাম– তিনি যে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা এবং আমাদের নেতা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর মনোনীত রাসুল এবং অবতীর্ণ বাক্যগুলো হলো মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারিমের অংশ– এসকল পরিচয় প্রদানের আগেই এবং এই নতুন দীন বা ধর্মের নাম যে ইসলাম– সে কথাও বলার আগে। সকল পরিচয়ের পূর্বেই, সকল উদ্দেশ্য বর্ণনা করার আগেই নিছক একটি আদেশসূচক শব্দে জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিকে বললেন– اِقْرَأْ- পড়ো।

মুসলিম উম্মাহর জন্য কি এর মধ্যে কোনো ইঙ্গিত ও ইশারা নেই? কিছুই কি শিক্ষার নেই এর মধ্যে? এমনটা কি ভাবা যায়– বিধান হিসেবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ কোরআনের প্রথম শব্দটি এমন কোনো শখজাতীয় বিষয় হবে, যা কেউ ইচ্ছা করলে ভালোবাসবে, ইচ্ছা করলে অপছন্দ করবে? কিংবা কেউ বা তার ক্ষেত্রে দ্রুতই ক্লান্তিবোধ করবে?

মহাগ্রন্থ কোরআনের প্রথম আদেশ– اِقْرَأْ। তা কি এমন গুরুত্বহীন ভাবার দুঃসাহস দেখানো যায়! এটা যে মহান রবের পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি প্রথম আদেশ!

পবিত্র কোরআনে ৭৭ হাজারেরও বেশি শব্দ রয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ শব্দের মধ্য থেকে কোরআন অবতরণের প্রথম শব্দ হিসেবে নির্বাচিত হলো এই 'اِقْرَأْ' শব্দটি! কত গভীর তাৎপর্যই না লুকিয়ে আছে এর মাঝে!

অথচ কোরআনুল কারিমে আরও হাজারো আদেশবাচক শব্দ রয়েছে। যেমন–

أَقِمِ الصَّلَاةَ- আপনি নামাজ পড়ুন।

آتُوا الزَّكَاةَ-তোমরা যাকাত প্রদান করো।

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ -তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো।

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ-সৎকাজের আদেশ করুন।

وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ -খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করুন।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ - আপনার ওপর আপতিত বিপদে ধৈর্যধারণ করুন।

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ-আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তোমরা তা থেকে খরচ করো।

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ -তোমরা আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসো...।

এমন আরও অসংখ্য আদেশসূচক শব্দ-বাক্য কোরআনুল কারিমে এসেছে। অথচ এই এত এত আদেশের মধ্য থেকে প্রথম আদেশের ক্ষেত্রে নির্বাচন করা হলো– اقرأ- পড়ো- আদেশটি!

আরেকটু লক্ষ করি– এ সুরায় পড়ার বিষয়টি শুধু প্রথম শব্দের ওপরই সীমাবদ্ধ নয়... বরং দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে– কোরআনুল কারিমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়া পাঁচটি আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে এই পড়াকে কেন্দ্র করে এবং এই পাঁচ আয়াতের মধ্যে 'اقرأ' শব্দটি দু'বার এসেছে!

প্রথম আদেশ, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

এরপর বলা হয়েছে, اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

এরপর তিনি বলেন, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

এখানে কলম শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়– পড়ার আদেশটি কলম দ্বারা লিখিত কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত; এতে রূপক বা অলংকারিক কোনো অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

তাই একজন মুমিনের জন্য 'পড়া' বিষয়টা এতটাই গুরুত্বহ!

এখন আমাদের একটি প্রশ্ন হতে পারে– আমরা কেন পড়ব? পড়াটা কি একটি মাধ্যম না চূড়ান্ত লক্ষ্য?

হ্যাঁ, পড়া একটি উপলক্ষ বা মাধ্যম। আমরা শেখার জন্য, জানার জন্য পড়ি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিষয়টিও কোরআনের প্রথম পাঁচ আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

যদিও পড়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জ্ঞান অর্জন করা বা জানা, তবু আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিম 'تعلم' শব্দ দিয়ে শুরু করেননি; তিনি শুরু করেছেন 'اقرأ' শব্দ দিয়ে।

সন্দেহ নেই– পৃথিবীতে শেখার বা জানার অনেক মাধ্যম রয়েছে। যেমন- শোনা, দেখা, সংবাদ ও ইন্দ্রিয় অনুভবের অভিজ্ঞতা। তবু বলতে হয়– শেখার বা জানার

সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো 'পড়া'। আয়াতের মাধ্যমে তাই আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের জানাতে চান– শেখা ও শেখানোর আরও অনেক মাধ্যম থাকলেও তোমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী মাধ্যম হলো 'পড়া'।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতগুলোর মধ্যে আমাদের পড়ার ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তাআলা বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

অতএব আমাদের পড়া শুরু হবে আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে এবং আমাদের এমন কিছু পড়া উচিত নয়, যাতে আল্লাহ রাগান্বিত হন কিংবা যা আল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন। আমাদের পড়া হবে আল্লাহ তাআলার জন্য। আমাদের পড়া হবে আল্লাহ নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী। আমরা পড়ব– মানুষ ও পৃথিবীর উপকারের জন্য। আমরা পড়ব দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ বলে পড়ার নির্দেশের মাধ্যমে অনর্থক, তুচ্ছ ও বিকৃত কিংবা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী কোনো পড়ার প্রতি আদেশ করেননি। নীতিটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. তোমার এই পড়া ও প্রজ্ঞা, তোমার এই জ্ঞান ও অর্জন– তোমাকে যেন তোমার বিনয় থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। তোমাকে যেন অহংকারী করে না তোলে। যে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করেছ, তার জন্য কখনোই অহংকার করবে না। বরং সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবে– আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর মাধ্যমে তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তিনিই একমাত্র দাতা। আল্লাহ বলেন–

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ .

তিনিই সেই সত্তা عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না] এই বোধটি কখনোই যেন কোনো পাঠক বা শিক্ষার্থীর মাথা থেকে দূরে না সরে। চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অবশ্যই কেউ কেউ তার সময়ে জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হতে পারে... তাকেও স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই তাকে এই ইলম বা জ্ঞান দান করেছেন, সক্ষমতা দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاتَّقُوا اللهَ...وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো... তিনিই তোমাদের শিক্ষা দেন।

আল্লাহ আরও বলেন,– وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلً

আর তোমাদের তো দেওয়া হয়েছে নিতান্ত স্বল্প জ্ঞান।

অর্থাৎ, মানুষের যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা আল্লাহ তাআলাই দেন এবং তার বিপুল ও বিশাল জ্ঞানসমুদ্রের তুলনায় আমাদের প্রদত্ত এই জ্ঞান যৎসামান্য, খুবই কম, অত্যন্ত স্বল্প। সুতরাং তুমি যা জানো, সে ব্যাপারে যে জানে না, তার ওপর কিছুতেই অহংকার প্রকাশ করবে না।

এভাবে কোরআনের প্রাথমিক আয়াতগুলোই আমাদের জ্ঞান অন্বেষণ এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার খুবই মূল্যবান একটি পাঠ-নির্দেশিকা উপস্থাপন করছে। অবশ্যই আমরা স্বীকার করি এবং করতেই হবে– জ্ঞান ও ইলমের নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে। তাই এই ইলম ও প্রজ্ঞা, পড়ার শক্তি ও ক্ষমতা এমন দিকে ফেরাতে হবে– যার প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট।

সিরাত থেকে দ্বিতীয় শিক্ষা

নবিজীবনের শিক্ষা থেকে আমরা যখন উপরের আলোচনাটি দেখলাম ও গ্রহণ করলাম, এবার আমরা সে সময়ের আরেকটি নীতি-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। ঘটনাটি ছিল খুবই বিস্ময়কর, অসাধারণ এবং একেবারেই অভূতপূর্ব– তখনকার সময়ের জন্য, সকল সময়ের জন্য– এমনকি আমাদের সময়ের প্রেক্ষিতেও।

বিষয়টি হলো, বদর যুদ্ধে মুশরিক বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের প্রক্রিয়া...
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক বন্দিদের শর্ত দিলেন,'কোনো বন্দি যদি দশজন মুসলমানকে পড়ালেখা শেখায়, তবে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে।'

মুক্তিপণের এই পদ্ধতি ছিল খুবই অভিনব, অভূতপূর্ব ও অসাধারণ... বিশেষত সেই সময়ে, যখন চারদিকে অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও নিরক্ষতার প্রাধান্য। শিক্ষার বিষয়টা সেখানে গুরুত্বই পেত না।

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন– যে জাতি উন্নতি ও অগ্রগতি চায়, যে জাতি চায় নতুন শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে, তাদের জন্য লেখাপড়া ও শিক্ষা-দীক্ষা অনিবার্য এক হাতিয়ার। তিনি শিক্ষার বিনিময়ে বন্দিদের মুক্ত করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো কোথাও এমন ঘটনা ঘটেনি।

অথচ বদরের সময়ে আমরা যদি মুসলমানদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব– তাদের তখন খুব নগদ অর্থের প্রয়োজন– যা দ্বারা হয়তো এই নিরস্ত্র মুসলমানদের জন্য অস্ত্র কেনা হবে। কিংবা কুরাইশদের এসকল যোদ্ধার মুক্তি না দিয়ে বন্দি করে রাখাই প্রয়োজন– যাতে মক্কার কাফির বাহিনীকে দুর্বল করে রাখা যায় কিংবা পরবর্তীতে মুসলমান কেউ বন্দি হলে, এদের দিয়ে বন্দি বিনিময় করা যায়। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু চিন্তা

করলেন, যা ছিল এগুলোর চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ... আরও বেশি দূরদর্শিতাপূর্ণ– তা হলো মুসলমানদের পড়ালেখা শেখানো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তায় শিক্ষার এই গুরুত্বটি সবসময় শীর্ষ চূড়ায় থাকার কারণে তিনি মুসলিম উম্মাহকে সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ করে বিনির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে যিনি লেখাপড়া জানতেন, তিনি তাকে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী করে রাখতেন। তুমি জায়েদ বিন সাবেতের কথাই চিন্তা করে দেখো না– যাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বড় বড় সাহাবির ওপর সেনানায়ক বানিয়েছিলেন। জায়েদ বিন সাবেত রাযিআল্লাহু আনহু সবসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থাকতেন– কেননা তিনি খুব সুন্দর লিখতে ও পড়তে জানতেন। এ কারণে তিনি একজন 'কাতেবে ওহি'– ওহি লেখক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন চিঠি লিখে দিতেন। বিভিন্ন চিঠিপত্র আরবি ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করে দিতেন। এসকল কাজ যখন তিনি আঞ্জাম দিচ্ছেন– তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর।

আমরা সকলেই আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহ আনহু-এর প্রখর মুখস্থশক্তি সম্পর্কে অবগত। অথচ তিনি ছাড়াও আরও অনেক সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুখস্থকারী ছিলেন। তারপরও তিনি নিজের সম্পর্কে যা বলেছেনে সেটা আমাদের লক্ষ করার বিষয়...যেমন বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনায় এসেছে–

وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي.

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ তার ভাই থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে তাঁর থেকে আমার চেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী কেউ নেই।'

অধিক হাদিস বর্ণনার এই মহান মর্যাদা সত্ত্বেও তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিআল্লাহু আনহুমাকে মর্যাদার ক্ষেত্রে সবসময় এগিয়ে রাখতেন।... কিন্তু কেন? কারণ হলো– আমর ইবনে আস রাযিআল্লাহু আনহু লিখতে ও পড়তে জানতেন আর তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না।

হজরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু নিজেই এ সম্পর্কে বলেন,

إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.

'কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ছিলেন ব্যতিক্রম– কারণ, তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।'

মর্যাদার ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে এগিয়ে রাখার এই হলো কারণ।

নবিযুগের এসকল রীতি ও পদ্ধতি এবং আরও বিভিন্ন উৎসাহ ও প্রেরণার কারণে মুসলমানদের অন্তরে পড়ালেখার প্রতি এক অনুপম ভালোবাসা রোপিত হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়– পৃথিবীর অন্যান্য লাইব্রেরির চেয়ে ইসলামি লাইব্রেরিগুলোই ছিল বেশি বড়, ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। বরং বলা যায়– দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্বইতিহাসে মুসলমানদের লাইব্রেরিগুলোই ছিল সবচেয়ে বড়। যথা : বাগদাদ লাইব্রেরি, কুরতুবা, গ্রানাডা, কায়রো, দামেশক, মাদিনা ও বাইতুল মাকদিসে...। এ ব্যাপারে মুসলমানদের রয়েছে অনন্য সভ্যতা, সৃজনশীলতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক সোনালি ইতিহাস।

ইসলামের মানদণ্ডে এমনই ছিল পড়ালেখার মূল্য ও মর্যাদা...

মুসলমানদের ইতিহাসে এমনই ছিল পড়ালেখার মূল্যায়ন ও চর্চা...

কিন্তু বর্তমানের দিকে যদি তাকাই...!

আহা! আফসোস!

পড়ালেখার এই আলোকিত ইতিহাস, মূল্যায়ন ও মর্যাদা সত্ত্বেও আজ মুসলিম উম্মাহর একটি বিশাল অংশ একেবারে নিরক্ষর– পড়তে জানে না। লিখতে পারে না। অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই। কোরআনের জাতির জন্য এটা বাস্তবিকই একটা বড় অধঃপতন। এটা সেই জাতির জন্য কত বড় অধঃপতনের আলামত– যার জীবনবিধানের প্রথম আদেশ ও প্রথম শব্দই হলো 'اِقْرَأْ'- পড়ো।

পুরো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যারা আদতেই কিছু পড়তে বা লিখতে পারে না– তাদের অনুপাত প্রায় ৩৭%!

এই ব্যাপক সংখ্যক নিরক্ষর জনগণ থাকা সত্ত্বেও ইসলামি বিশ্ব তার জাতীয় উৎপাদনের ৪% এরও কম খরচ করে শিক্ষা-দীক্ষার পেছনে। এর দ্বারাই বোঝা যায়– এই বিশাল সংখ্যক মানুষের নিরক্ষরতা আমাদের ধনভাণ্ডারের কমতির কারণে নয়– অবহেলা উদাসীনতার কারণে। অথচ এই নিরক্ষরতা এমনই এক ধ্বংসাত্মক সমস্যা– যা অচিরেই রোধ করা প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, উল্লিখিত ৩৭% নিরক্ষতা হলো প্রকৃতই যারা নিরক্ষর– পড়তেও জানে না, লিখতেও পারে না।

এই নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা ছাড়াও উম্মতের মধ্যে আরও বিভিন্ন ধরনের অস্পষ্ট নিরক্ষরতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– তাদেরকেও আমরা এক ধরনের নিরক্ষর বা

অশিক্ষিত বলতে পারি– যারা হয়তো খুব ভালো পড়তে ও লিখতে পারে– কিন্তু প্রচলিত ধারার তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ হয়েছে তো পড়ালেখাই ছেড়ে দিয়েছে। এখন আর বই ধরে না, বই পড়ে না। আবার কেউ হয়তো জীবনের একটি দীর্ঘ সময় পড়ালেখার মধ্যে অতিবাহিত করেছে, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ-সমাজে যা কিছু ঘটে চলেছে, সেসবের আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোরও অনেক কিছু সে জানে না।

এ কেমন শিক্ষা!

শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিত থাকার আরেকটি উদাহরণ হলো– ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

এমন অনেক শিক্ষিত পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিখ্যাত ডাক্তার কিংবা বিদগ্ধ অ্যাডভোকেট– যারা তাদের নিজ নিজ বিষয়ে অসাধারণ দক্ষ অভিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু নিজের ধর্মের মৌলিক বিধানাবলি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ মূর্খ।

অথচ তিনিই হয়েছেন মহান বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান শিক্ষক– যেখানে বিশ্বের সকল জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয়। এমন একজন শিক্ষকের কথা তোমাদের বলি– তিনি দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণ করছেন। এই তিনিই একদিন আড্ডার মাঝে তার এক সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন– আচ্ছা, নামাজে তাশাহহুদের সময় আমরা কী পড়ব? সুরা ফাতিহা নাকি?

আহা! তিনিও একজন মহান বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান শিক্ষক!

এবার একজন শিক্ষিকার কথা বলি– আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এমন একজন শিক্ষিকাও পেয়েছি– যিনি একদিন আলোচনার মাঝে বললেন, তিনি এবং তাঁর স্বামী বাসায় জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেন। কখনো তাঁর স্বামী ইমাম হন, কখনো তিনি– স্বামীর নামাজের ইমামতি করেন স্ত্রী!

আহা! ধর্মের মূল ভিত্তি যে নামাজ– তার ক্ষেত্রেই যদি আমাদের এই অবস্থা, তাহলে দীনের অন্যান্য বিষয়ে আমাদের অবস্থাটা কেমন? না-জানি আরও কতটা ভয়াবহ!!

তাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তবে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা হবে কেমন– সহজেই অনুমেয়।

এবার ছাত্রদের কথাও কিছু বলি– একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল ইসলামের খলিফাদের ধারাবাহিকতা বিষয়ে– প্রথম খলিফা কে?... দ্বিতীয় খলিফা কে? তৃতীয়...চতুর্থ... এমন....

খুবই আফসোসের কথা– তরুণদের মধ্যে একজনও সঠিকভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি! অথচ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র!

নিশ্চিতভাবে– এগুলোও বাস্তব নিরক্ষরতা, ভয়াবহ অশিক্ষা অজ্ঞতা ও মূর্খতা... এমন ব্যক্তিদের শিক্ষিত বলা যায় কোন যুক্তিতে?

আবার কিছু লোক আছে রাজনীতি সম্পর্কে অশিক্ষিত। তার চারপাশের পৃথিবীর মানুষের মধ্যে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সে জানে না– কীভাবে এই ব্যবস্থাপনাগুলো চলছে? সে জানে না– কী ঘটছে ফিলিস্তিনে ও ইরাকে। সে জানে না– বর্তমানে কী ঘটছে আমেরিকা ও ইউরোপে। এমনকি কারও কারও ক্ষেত্রে অবস্থা এরচেয়েও আরও করুণ– তার নিজ দেশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান নেই।

আবার কিছু অশিক্ষিতের উদাহরণ হলো– তারা কোনো নিয়ম-কানুন জানে না। একজন ব্যক্তি হিসেবে সময় ও কর্মের বিভিন্ন স্তরে কী তার কর্ম ও কর্তব্য– কী তার অবশ্যপালনীয়– এসবের কিছুই সে জানে না।

উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে অজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তুমিই এবার জ্ঞান ও জানাশোনার অন্যান্য বিষয়গুলোও অনুমান করে নাও– সেগুলো অবস্থাও কেমন হতে পারে।

গভীর অধ্যয়ন, বিশেষ কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ দক্ষতা কিংবা জীবনের গভীরতম বোধ, সভ্যতা ও সাহিত্যকতা– এই উচ্চমার্গীয় প্রশংসনীয় আচার তো অনেক দূরের কথা– মানুষ আজ আবশ্যক সেই পড়াগুলোও পড়ে নিতে রাজি নয়– যা তার জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

এই হলো আধুনিকতার ভয়াবহ এক রিদ্দাহ– সভ্যতার আর্দ্র শেকড় থেকে জীবননাশক বিচ্যুতি।

আহা! কেউ কি ভাববে না!

এই উম্মতের উন্নতির চাবিকাঠি হলো একটি মাত্র শব্দ 'اِقْرَأْ'– পড়ো।

আহা! কেউ কি বুঝবে না!

পড়ালেখা ছাড়া এই উম্মতের উন্নতি করা কোনোকালেই সম্ভব নয়...

অথচ পড়ালেখা থেকে আজ কত দূরেই না সরে গেছে এই উম্মত!!

একবার এক ইহুদিকে আরবদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ইহুদি উত্তরে বলেছিল, 'আমরা আরবজাতিকে ভয় করি না। কারণ, আরবজাতি পড়ালেখা করে না।'

যদিও ইহুদিদের চেয়ে অধিক মিথ্যুক আর পৃথিবীতে হয় না, তবুও এই ক্ষেত্রে ইহুদিটা সত্য কথাই বলেছিলেন। যে জাতি পড়ালেখা করে না, সে জাতি সমীহপূর্ণ মর্যাদা ধরে রাখতে পারে না, সচেতন ও সজাগ থাকে না...তার আবাস নিরাপদ থাকে না।

তাছাড়া আমাদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে আরও কিছু বিভ্রান্তিকর দিক রয়েছে। আমাদের সেগুলোর দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন, অনেক তরুণ রয়েছে– যারা জীবনের দীর্ঘ একটা সময় পড়ালেখার মধ্যে অতিবাহিত করে, অথচ পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে না। তারা যেন এখনো বুঝেই উঠতে পারেনি– তাদের আসলে কী পড়া উচিত!

প্রতিদিন তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন পড়ার মধ্যে সময় নষ্ট করছে– উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো পড়া– একবার খেলাধুলার সংবাদ পড়ছে, পরক্ষণেই চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে কোনো শিল্প বা প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদে... কিংবা সময়গুলো নষ্ট করছে অন্যকিছুতে– হয়তো আবেগতাড়িত কিছু গল্প-উপন্যাস, প্রেমের কাহিনি, রহস্য পত্রিকা কিংবা গোয়েন্দা কাহিনি...।

তারা আসলে অনেক শব্দ এবং বাক্যের পর বাক্য পড়ে যায়– কিন্তু একেবারেই অনর্থক; এগুলো কোনোই কাজে আসে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়, দিনের পর দিন, মাস যায়, বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়... এতসব পড়ার পর অবশেষে কী হয়?... কী হয়?

কিছুই হয় না।

শিক্ষার জগতে এই অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলাও আমাদের একটি বড় ক্ষতির কারণ। একজন মানুষ বা শিক্ষার্থী– পড়াশোনা যেমন তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস, তেমনিভাবে পাঠ্য বিষয়ের সঠিক নির্বাচনও অতীব জরুরি বিষয়। মনে রাখা দরকার– এলোমেলো পাঠের ফল কখনো সুমিষ্ট হয় না।

দুটো সমস্যা ও সমাধান

পড়ার ক্ষেত্রে কিংবা পড়তে চাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে আরও দুটো সমস্যা এসে দেখা দেয়–

১. কিছু মানুষ তো পড়তেই অভ্যস্ত নয়। পড়তে বসলেই ক্লান্তি ও আলস্য এসে চেপে ধরে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তবুও তারা যদি আরেকটু উদ্যম ও প্রত্যয় নিয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে এবং পড়তে শুরু করে– আবারও সেই দুর্দমনীয় ঔদাস্য-অলসতা, ক্লান্তি ও ঝিমুনিরা এসে নতুন শক্তিতে চেপে ধরে...। কী যন্ত্রণা!

এদের জন্য এমন কিছু কার্যকর পথ ও পদ্ধতি প্রয়োজন– যেগুলো তাদেরকে পড়তে এবং পড়ার ওপর অটল থাকতে সাহায্য করবে।

২. এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা বাস্তবেই পড়াশোনা করে। পড়ার পেছনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নিয়ে পড়াশোনা করে না। বিক্ষিপ্তভাবে পড়তে থাকে। কারণ, তারা জানে না কোন পড়াগুলো তাদের জন্য সবচেয়ে উপকারী, অতি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন পড়াগুলো জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এদেরও এমন কিছু সুন্দর বই ও পাঠ্য-বিষয়ের দিকনির্দেশনা প্রয়োজন– যা হবে তাদের জন্য সবচেয়ে উপকারী ও কল্যাণকর। জীবন গঠনের জন্য হবে উত্তম রসদ ও হাতিয়ার।

আল্লাহ তাওফিক দিলে– সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লিখিত দুটো সমস্যারই সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পড়াকে ভালোবাসতে শেখার পদ্ধতি

এখানে পড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দশটি পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো। নিঃসন্দেহে এগুলো পড়ার প্রতি তোমার ভালোবাসা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। পড়াকে করে তুলবে তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও উদ্দীপনাপূর্ণ– ইনশাআল্লাহ।

১. লক্ষ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা

পড়ার ক্ষেত্রে তোমার লক্ষ্য কী, তুমি কেন পড়ো বা পড়বে, সেই লক্ষ্যটা স্মরণ রাখা।

আমি পড়ব–

কারণ, আল্লাহ তাআলা আমাকে পড়তে আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে এবং সকল মুসলমানকে স্পষ্ট আদেশের সুরে বলেছেন–'اِقْرَأْ- পড়ো'। এ কারণে আমার পড়া– এটা নিছক কোনো পড়া নয়, এটা আমার প্রতিপালকের আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ।

আমি পড়ব–

কারণ, আমি দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হতে চাই। ইলম ও জ্ঞান ছাড়া দুনিয়াতে যেমন কোনো সফলতা নেই; ইলম ও জ্ঞান ছাড়া সফলতা নেই আখেরাতেও। অজ্ঞতা সবসময়ই নিন্দনীয়, নিকৃষ্ট– ধ্বংসের আহ্বায়ক।

আমি পড়ব–

কারণ, আমি আমার চারপাশের মানুষকে উপকৃত করতে চাই– আমার বাবা-মা ও সন্তানকে। আমি উপকার করতে চাই আমার ভাই, বোন, স্বজন ও বন্ধুদের। উপকার করতে চাই যাকে চিনি– তাকে, যাকে চিনি না তাকেও। আমি হতে চাই 'মেশক-আতর' বহনকারীর মতো– পাশ দিয়ে যে-ই যাবে, আমি আমার সৌরভ দিয়ে তাকেই উপকৃত ও আনন্দিত করতে চাই।

আমি পড়ব–

কারণ, আমি আমার জাতিকে উপকৃত করতে চাই। যে জাতি পড়ালেখা ছেড়ে দেয়, সে জাতি হয়ে ওঠে অবজ্ঞেয়, অসম্মানিত ও মর্যাদাহীন। পড়ালেখাহীন অজ্ঞ জাতি হয়ে ওঠে যুগের গতিধারা থেকে পশ্চাৎপদ। হয়ে ওঠে অন্যের অনুসারী ও পদলেহী। এ কারণেই আমি পড়তে চাই। আমি আমার জাতিকে শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতায় সকল জাতির চেয়ে অগ্রগামী করতে চাই। নিজের মাঝে ও তাদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করতে চাই। আমি পড়তে চাই ও পড়াতে চাই। জাগতে চাই ও জাগাতে চাই...।

হে প্রিয় বন্ধু! এই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্পগুলো মাথায় রেখে তুমি যদি পড়তে পারো, তবে নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমার এই পড়ালেখা দ্বারা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। তুমি উপকৃত করতে পারবে নিজেকে, যাকে ভালোবাসো তাকে এবং উপকার করতে পারবে তোমার জাতিকেও।

নিঃসন্দেহে এই মহৎ লক্ষ্যের অনুভূতি ও চেতনা তোমার পড়ার আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। তোমার পড়াশোনার মুহূর্তগুলোকে করে তুলবে আরও বেশি আনন্দময়– অর্থময়।

আর যদি তোমার মস্তিষ্কে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে, তাহলে তুমি 'সুরা আলাক'-এর মধ্যে যেই নীতি দুটোর কথা স্মরণ করানো হয়েছে, সেগুলো ভুলে থাকতে পারবে না। যেহেতু তুমি তোমার পড়া শুরু করবে আল্লাহর নামে– তাহলে নিশ্চয় এমন কিছুই পড়বে না, যা এই মহান নামের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হয়। পাশাপাশি তুমি তোমার এই পড়ালেখা ও জানাশোনা নিয়ে অহংকার করবে না। কারণ, তুমি তো জানোই মহান সম্পদ ও মর্যাদা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন।

অর্থাৎ প্রথমে পড়ার ক্ষেত্রে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা, এরপর সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি রাখা– এটাই হলো দশটা পদ্ধতির মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি– যা পড়ালেখার প্রতি তোমাকে আরও আগ্রহী করে তুলবে এবং পড়াটাকে তোমার জীবনব্যাপী অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া এই পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমার অর্জিত হবে। যথা :

১. প্রতিটি উপকারী ইলম বা জ্ঞান অর্জন করার কারণে তুমি এর প্রতিদান ও পুরস্কার পাবে। তোমার পঠিত প্রতিটি বর্ণের জন্য তুমি একটি করে সওয়াব পাবে।

২. তোমার এই জ্ঞান অন্বেষণের পেছনে যেহেতু কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তাই অধীত পাঠগুলো খুব সহজেই তোমার মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে শেকড় গেঁথে বসে যাবে।

৩. তাছাড়া তুমি তোমার সকল পড়াকেই উপভোগ করতে পারবে এবং এটি শুধু ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হবে, এমন নয়– বরং প্রত্যেক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই উপভোগ্যতা তুমি অনুভব করবে।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এই পদ্ধতিটা খুবই চমৎকারভাবে একটি অন্যরকম উদ্যম এনে দেবে। কোনো পড়াই আর নিরর্থক ও ফলহীন মনে হবে না। তখন একজন

রাজনীতিবিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তি যেমন তার পড়াকে আত্মিকভাবে উপভোগ করবে তেমনিভাবে ইতিহাসের কোনো পাঠক কিংবা অর্থনীতির পাঠকও তাদের পড়াকে উপভোগ করতে পারবে। মনের মধ্যে অন্য ধরনের এক উদ্দীপনা ও তৃপ্তি খেলা করে বেড়াবে সকলের। যিনি পাঠক, তিনি জানেন– এই পাঠ-উপভোগ্যতার আনন্দের কাছে সপ্ত রাজার প্রাপ্ত বিলাসও কত তুচ্ছ! কত তুচ্ছ!!

পড়ার প্রধান কাজই হলো ভেতর থেকে জাগ্রত হওয়া। জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে উপভোগ করতে শেখা। তাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের শিক্ষার্থীরাও যদি তাদের পড়াটাকে উপভোগ করতে শেখে, তাহলে খুব সহজেই সন্তানদের নিয়ে পিতা-মাতার দুশ্চিন্তা, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার পেরেশানি অপসারিত হতে পারে। তখন আর সন্তানদের ওপর কিংবা ছাত্রদের ওপর বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজন হবে না। শাস্তি প্রদানেরও প্রয়োজন দেখা দেবে না। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আনন্দ ও উপভোগ্যতা নিয়ে নিজেরাই পড়বে।

প্রাথমিক পর্যায়ে অভিভাবকদের কর্তব্য হবে– ছাত্র-সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে তাদের ঝোঁককে নতুন নিয়ত ও নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে দেওয়া। পড়ালেখার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তাদের সামনে উপস্থাপিত করা, যাতে তাদের দিন, তাদের মাস এবং বছরগুলো অনর্থক এলোমেলোভাবে নষ্ট না হয়। একেবারে শুরু থেকেই তাদের জীবন যেন হয় একটি মহৎ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত ও ক্রম অগ্রসরমান...।

আজ কত তরুণকে দেখা যায়– শিক্ষার্থী হিসেবে ষোলো অথবা সতেরো বছর পড়ালেখা করে প্রতিষ্ঠান থেকে বের হচ্ছে, তবে জ্ঞানের বদলে বের হচ্ছে একরাশ মূর্খতা নিয়ে। দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করে– তারপর প্রথম ভাবতে বসে এখন কী করা যায়! কী করলে আমার ভালো হয়!! মূর্খের মূর্খ... আফসোস!

এ কারণে একজন ছাত্রের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ও দুর্দশা হলো, তার লক্ষ্য বা টার্গেট না থাকা। লক্ষ্যহীনভাবে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া– কিংবা তার লক্ষ্যের সাথে তার পড়ালেখার কোনো সংযোগ না থাকা। এ কারণে সবসময় আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্ডিত বা আলেমগণ বারবার বোঝাতে থাকেন– কেউ যদি তার জীবনের কোনো ক্ষেত্রে সফল হতে চায়– তবে তার প্রধান কর্তব্য হবে, আগে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করা– লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা।

২. পড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা

নিজের লক্ষ্য যদি নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন আর এলোমেলোভাবে পড়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তবে গোছালোভাবে পড়তে চাইলে পড়ার জন্য একটি সুস্পষ্ট

পরিমাণ নির্ধারণ করে নেওয়া প্রয়োজন। আর এটা অবশ্যই তোমার সময় ও সক্ষমতার ওপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করে নির্ধারণ করতে হবে। নির্ধারিত বইগুলোও নাগালের মধ্যে হতে হবে। এরপর তোমাকে আরও আবশ্যিকভাবে জানতে হবে- এই সময়ে এ বইগুলো তুমি কেন পড়বে?

এই আনুসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা রাখার পর এবার তুমি তোমার সময়, শক্তি ও সক্ষমতা অনুযায়ী পড়ার জন্য একটি স্পষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে নাও। যেমন, আমি এই পাঁচটি বই আগামী ছয়মাসের মধ্যে পড়া শেষ করব। কিংবা এই বিশটি বই আগামী এক বা দুই বছরের মধ্যে পড়ে শেষ করব এবং সেগুলোর মধ্যে পূর্ব-পরও নির্ধারণ করে নিতে হবে যে, এই বইটি আমি এই সময়ের মধ্যে শেষ করব। এরপর এটা... তারপর এটা...। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- তুমি নিজের জন্য যেই সময় নির্ধারণ করে নিবে, অতি আবশ্যিকভাবে সেটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করবে। একান্ত অনিবার্য কোনো কারণ ছাড়া এই নির্ধারণের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনবে না।

এটা ঠিক- প্রথম দিকে এই নিয়ম মেনে চলতে কষ্ট হবে, ক্লান্তি ও বিরক্তি লাগবে। কিন্তু তুমি যদি নিয়মনিষ্ঠভাবে এগুলো সম্পূর্ণ করার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী ও প্রতিজ্ঞ হও এবং নিয়মিত চালিয়ে যেতে পারো- তবে এক সময় এর জীবনভরা সুফল দেখে তুমি নিজেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়ে যাবে।

তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে- পাঠপরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অনুসরণ করবে। অতি অল্প সময়ের জন্য এত বেশি বই নির্ধারণ করা ঠিক নয়- যা শেষ করার ক্ষেত্রে তুমি নিজেই হতাশ হয়ে পড়বে কিংবা ব্যর্থ হবে। আবার এটাও উচিত হবে না যে, অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য অল্প কিছু বই নির্ধারণ করলে- তবে তো তোমারই সময় নষ্ট হবে।

মাস শেষে একটু বিরতি দেবে। পেছনের সময়টার পর্যালোচনা করে নেবে। তোমার নির্ধারিত পাঠ-পরিমাণটি যদি সম্পূর্ণ না হয়- তবে তুমি নিজেকেই প্রশ্ন করো, আমি কি আমার নির্ধারিত পাঠ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলাম; না এখানে অন্য কোনো সমস্যা ছিল? পরিমাণ নির্ধারণ সঠিক ছিল, নাকি এখানে অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা এসেছিল? অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেগুলো নিয়ে আরেকবার চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো ত্রুটি থাকলে সংশোধন করে নিতে হবে। এরপর নতুন মাসের জন্য আবার নতুন উদ্যম নিয়ে শুরু করতে হবে।

ইনশাআল্লাহ! অচিরেই তোমার এই অব্যাহত মূল্যায়ন তোমার পাঠ-পরিমাণ সফলভাবে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠবে তোমার জ্ঞান-রাজ্যের সবুজ ভুবন।

পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে– লক্ষ্য নির্ধারণের পর এটাই হলো দ্বিতীয় মাধ্যম বা পদ্ধতি। অর্থাৎ পাঠপরিমাণ নির্ধারণ করা।

৩. পড়ার সময় নির্ধারণ করা

পড়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে নাও। অর্থাৎ তোমার যা পড়তে হবে তা পড়ার জন্য দিনের শেষের দিকে চেয়ে থাকবে না। বরং পড়ার ক্ষেত্রে নিজের জন্য একটা নির্ধারিত সময় বের করে নাও। আর এই নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। পড়ার জন্য তুমি এমন সময় নির্ধারণের চেষ্টা করো– যখন তোমার মস্তিষ্ক থাকে সতেজ সজীব এবং তুমিও থাকো নির্ভার সুস্থির। এতে করে পড়ার মধ্যে তোমার সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারবে এবং এর দ্বারা সুন্দর কিছু অর্জন তোমার জীবনে যুক্ত হবে।

যেমন– ছাত্ররা তো রাতদিন এক করে পড়বে। [কর্মজীবী ব্যস্ত মানুষদের ক্ষেত্রে বলি] আপনি যদি কর্মব্যস্ত লোক হন– আপনার পড়ার সময়টি হতে পারে ফজর নামাযের পর থেকে সূর্য পুরোপুরি উদিত হওয়া পর্যন্ত। কিংবা মাগরিবের পূর্বে এক ঘণ্টা। অথবা মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত কিংবা ইশার পর ঘুমের আগ পর্যন্ত... এভাবে নিজের চাকুরি বা কর্মের মাঝে নিজের জন্য উপযুক্ত সময়গুলো আপনি নির্বাচন করে নিতে পারেন।

তাছাড়া কাজের ফাঁকের সময়গুলো থেকেও সুবিধা অর্জন করা যায়। ফাঁকের সময়গুলো বলতে বোঝাতে চাচ্ছি– হয়তো একটি কাজ থেকে আরেকটি কাজে উপনীত হওয়ার পূর্বের ফাঁকা সময়। এগুলোও পড়ার মধ্যে কাজে লাগিয়ে ফেলা। যেমন– দেখা-সাক্ষাতের মাঝের সময়গুলো, কিংবা ব্যবসা ও দোকানদারির ফাঁকে– যখন খরিদ্দার বা কাস্টমার থাকে না। কিংবা যখন আপনি কারও আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। অথবা হয়তো অফিসেই পরবর্তী কোনো কাজের প্রতীক্ষায় রয়েছেন...।

এ ধরনের আরও অনেক মধ্যবর্তী সময় আপনি পাবেন– যেগুলো পড়ার মধ্যে কাজে লাগিয়ে সুন্দর প্রতিফল পাওয়া সম্ভব। আর সবসময় আপনার সাথে কোনো না কোনো বই থাকা উচিত। যেখানেই যখন আপনি কোনো অবসর সময় পান, বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে ধরুন এবং পড়া শুরু করুন...।

আপনি যদি এভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন, নিশ্চিতভাবেই আপনি আপনার সময়ের বরকত পেতে থাকবেন এবং অতীতের তুলনায় আপনার দিনগুলো হয়ে উঠবে আরও প্রলম্বিত ও বিস্তৃত। দিনকে দিন আপনি হয়ে উঠবেন আরও প্রাজ্ঞ ও সমৃদ্ধ।

৪. পরিমিত ধীরতা

পড়াশোনার গুরুত্ব ও পদ্ধতি নিয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো, এগুলো পড়ে কেউ কেউ নিশ্চয় পড়ার প্রতি ভীষণভাবে উদ্দীপিত হবে। ছলকে উঠবে তার হিম্মত ও প্রত্যয়। হয়তো অমিত আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বহু বই কিনে এনে গোগ্রাসে গিলতে থাকবে। পড়ার জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ সময় বের করে নেবে... বরং এমনও হতে পারে যে, তার এই বুভুক্ষু পাঠ জীবনের অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় দখল করে নেবে...

এমন কোনো পাঠকের ক্ষেত্রে আমি বলি, বন্ধু! একটু ধীরে... একটু রয়ে সয়ে...। এ পথ বড় কঠিন ও অমসৃণ, এখানে প্রতিটি পদক্ষেপ হবে বিচক্ষণার সাথে। বিশেষ করে তুমি যদি পড়ার ব্যাপারে আগে থেকে তেমন অভ্যস্ত না হয়ে থাকো; তবে এমনটি করো না। এতটা ব্যগ্র হয়ে ওঠো না। নতুবা খুব দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। হয়তো একেবারে পড়াশোনাই ছেড়ে দেবে।

বরং তোমাকে হতে হবে অলিম্পিকের 'ম্যারাথন' দৌড়বিদদের মতো। বিশাল দীর্ঘপথ তারা দৌড়ায়– বহুদূরে তারা যায়। কিন্তু তাদের সূচনা হয় খুবই ধীর ও মন্থরতার সাথে। এরপর ক্রমান্বয়ে তারা তাদের দৌড়ের গতি বাড়াতে থাকে এবং অবশেষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। পড়ার বিষয়টিও ঠিক এমন। এর পথও বহু দীর্ঘ– একজন মানুষের জীবনের সমান। কারণ, এটা যে জীবনের সঙ্গী। তাই এটাকে যদি তুমি তোমার জীবনের 'মানহাজ' বা 'পথপাথেয়' বানিয়ে থাকো, তবে তুমি এর সূচনা করো বুদ্ধিমত্তার সাথে, ধীরতা ও সতর্কতার সাথে। তাহলে ইনশাআল্লাহ একদিন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

৫. একাগ্রতা

শুরুর দিকে আমরা উল্লেখ করেছি, পড়া কোনো শখের বিষয় নয়। এটা অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ। এটার জন্য দরকার হয় মেধা, বুদ্ধি ও চিন্তা এবং সম্পদ, শ্রম ও নিজেকে উৎসর্গ করা। এটাকে খুবই ধৈর্য, স্থৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তুমি যখন কোনো বই পড়বে, তার প্রতিটি শব্দ-বাক্য সম্পূর্ণভাবে বুঝে বুঝে পড়বে। এমনভাবে পড়বে, যাতে এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হতে পারো এবং অন্যকেও উপকৃত করতে পারো। পড়া একটি অতি মহৎ কর্ম– তবে এক্ষেত্রে যতটুকু তুমি বুঝবে, ততটুকুই শুধু তোমার অর্জন– অন্যথায় তা হবে শুধুই কালো কালো অক্ষরের দিকে তাকিয়ে থাকা, শুধুই বসে থাকা ও সময় নষ্ট করা। এ কারণে তোমার ব্যাপারে আমার উপদেশ হলো– তুমি যখন যা কিছু পড়বে, মনোযোগের সাথে পড়বে। একাগ্রতার সাথে পড়বে। এমনভাবে পড়বে ও বুঝবে– যদি তোমার কাছে কখনো তোমার পঠিত বিষয়ে

আলোচনা শুনতে চাওয়া হয়, তবে তুমি যেন তা বলতে পারো। নিছক চোখ বুলিয়ে যাবে না। যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামনে আসে, তার নোট রাখবে। যেমন– হয়তো পড়তে পড়তে এমন কিছু পেলে, যা তুমি তোমার ভাই-বোন বা সাথি-সঙ্গীদের জানাতে চাও– তাহলে এটা লিখে রাখো। কিংবা এমন কিছু বিষয় এলো– যেগুলোর অর্থ বা উদ্দেশ্য তুমি বুঝতে পারছো না– তাহলেও তুমি সেগুলো টুকে রাখো এবং এ ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের থেকে এক সময় সেগুলো বুঝে নাও। কিংবা পড়তে পড়তে দেখা গেল কোনো বইয়ের কিছু বিষয়ে তোমার আপত্তি রয়েছে, তাহলে সেটিও তোমার খাতায় টুকে নাও। এ জন্য যেকোনো বই পড়ার সময় তোমার কাছে একটা খাতা থাকা উচিত– এসব লিখে নেওয়ার জন্য।

তুমি যদি এসকল পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়াটাকে অব্যাহত রাখতে পারো, তাহলে তুমি যা-ই পড়বে, তাতেই নিজের মনোযোগ স্থির রাখতে পারবে। নিজের ভেতরে অর্জনের উৎফুল্লতা অনুভব করতে পারবে। যে ব্যতিক্রমী অপরিমিত সম্ভাবনার বীজ তোমার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, অচিরেই তা পত্র-পল্লবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। তোমার ধারণার চেয়েও বহুগুণ প্রবৃদ্ধি লাভ করবে তোমার অর্জন ও অর্জনের ক্ষমতা। এখানে 'একাগ্রতা' বলতে আমি যা বোঝাতে চাই, তুমি যদি তার প্রকৃত অর্থ বুঝে থাকো– তবে তুমি সাহাবি, তাবেয়ি ও মুসলিম উম্মাহর অতীতের সেই সোনালি চিত্র আবার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

আহা! তোমাকেই আমি আহ্বান করছি– পুনরাবৃত্তি ঘটাও সেই মহান জায়েদ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুম-এর ঘটনার। পুনরাবৃত্তি ঘটাও শাফি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, খাওয়ারেজেমি, জাবের ইবনে হাইয়ান রহিমাহুমুল্লাহ-এর জীবনের। পুনরাবৃত্তি ঘটাও তাঁদের জীবন, ইতিহাস ও কর্মপন্থার– পড়ালেখায়, ইলমের মগ্নতায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এবং আলোকিত কর্মের বর্ণচ্ছটায়...।

পৃথিবীকে আবার স্মরণ করিয়ে দাও– মানুষের মাঝে লুকায়িত সম্ভাবনার সূর্য উঁকি দিতে সক্ষম তার কল্পলোকেরও সীমা ছাড়িয়ে– আরও ঊর্ধ্বাকাশে।

৬. নিয়ম ও শৃঙ্খলা

জগৎ ও জীবনের প্রত্যেক বিষয়েই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা অতি উচ্চমানের দুটো গুণ। তুমিও চেষ্টা করো– তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তী ও পরিপাটি হওয়ার। সচেতন সজাগ দৃষ্টির সাথে কিছু পড়ার পর তুমি যখন তোমার বিশেষ খাতায় অধীত বিষয়গুলো লিখে রাখবে, সেগুলো এলোমেলোভাবে লিখো না। মুসলমান তার প্রতিটি কাজেই হবে নিয়মানুবর্তী এবং সুশৃঙ্খল।

তোমার কিছু বিশেষ খাতা থাকবে– পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যার একটিতে তুমি হয়তো ধর্মীয় বিষয়ে লিখবে, অন্যটিতে লিখবে রাজনীতি বিষয়ে, আর তৃতীয় আরেকটিতে লিখে রাখবে হয়তো সাহিত্য বিষয়ে। চতুর্থটিতে লিখবে ইতিহাস নিয়ে– এমনি আরও আরও বিষয়ের জন্য আরও আরও খাতা রাখবে...।

তুমি যদি আরও বেশি ব্যাপক ও গভীরতার সাথে অধ্যয়ন করতে চাও, তবে তোমার খাতা ও শিরোনামগুলো অন্যভাবেও সাজিয়ে নিতে পারো। আরও বিস্তারিতভাবে এবং আরও অতিরিক্ত শিরোনাম সংযুক্ত করে এবং এই খাতাগুলো কখনোই হারিয়ে যেতে দেবে না। এগুলো তুমি তোমার বাড়ি বা লাইব্রেরির এমন জায়গায় সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করবে, যেন কোনো জিনিস জানার জন্য, রেফারেন্সের জন্য খুব সহজেই খাতাগুলো পেতে পারো। যখন যেটা যেখান থেকে জানতে চাও, খুব সহজেই যেন জেনে নিতে পারো। এই চমৎকার কার্যকর পদ্ধতিটি তোমার অনেক শ্রম ও সময়কে বাঁচিয়ে দেবে।

নিয়মানুবর্তিতার এই সযত্ন অনুসরণ শুধু তোমার আবাস ও সময়কেই সুসজ্জিত করবে না– বরং তোমার মেধা বা মস্তিষ্ককেও করে তুলবে সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি। অনেক মানুষকে তুমি দেখবে– তারা কোনো বিষয়ে পরিপাটিত জ্ঞান রাখে না। গুছিয়ে কথাও বলতে পারে না। একবার বলছে পূর্বের কথা, আরেকবার বলছে পশ্চিমের কথা– তাদের কথায় কোনো সৌকর্য ও শৃঙ্খলা নেই। আবার অন্যদিকে এমন কিছু ব্যক্তির দেখাও তুমি পাবে– যাদের অধীত জ্ঞান ও বলিত কথন খুবই বিন্যস্ত ও গোছানো; যেন থরে থরে সাজানো মুক্তাদানা। এর দ্বারা বোঝা যায় তাদের মেধা, পাঠ ও মস্তিষ্কও কতটা পরিপাটি। তারা সকল কাজই খুব বিচক্ষণতার সাথে হিসাব করে করেন, প্রতিটি কথা বলেন মনোরম সঙ্গতির সাথে। তারা কিছুতেই তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যান না। কিছুতেই তারা তাদের আলোচ্যবিষয় থেকে দৃষ্টিকটুভাবে বাইরে বেরিয়ে আসেন না।

আর এগুলো অর্জন করতে হয় দীর্ঘদিনের অব্যাহত চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

আমি এখনো আমার কিছু বক্তৃতা উপস্থাপন করি আমার এমন কিছু খাতা ও পাতার সাহায্য নিয়ে– যেগুলো আমি লিপিবদ্ধ করেছি আজ থেকে দশ-পনেরো বছরেরও আগে। বছরের পর বছর এগুলো আমি সংরক্ষণ করেছি। আজ আমি বিভিন্ন সময় সেগুলোর দিকে চোখ বুলাই, কিছুটা সংযুক্ত করি এবং এভাবেই আমার বর্তমান বক্তৃতাগুলো প্রস্তুত করি।

আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলি– দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমি একটি বক্তব্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করে আসছিলাম, এতদিন পর সেটাই আজ দশ বা বিশটি বক্তব্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আহা! জেনে রাখো, কর্মের কিছুই হারিয়ে যায় না, কমে

যায় না– বরং নিয়মানুবর্তী হলে সবকিছু বাড়তেই থাকে। আল্লাহই তাওফিক দেন। এই বরকত ও সহজতা সম্ভব হয়েছে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার কারণে। এটা সম্ভব হয় সেই আত্মিক প্রশান্তির কারণে– তোমার নিজের এবং তোমার কাছের মানুষগুলোর জীবনটা শৃঙ্খলার ওপর ওঠার পর যে প্রশান্তি তুমি প্রাপ্ত হও।

৭. পারিবারিক লাইব্রেরি করা

একটি পারিবারিক লাইব্রেরির গুরুত্ব অনেক। 'সভ্যতার এক সোনালি বাহন' হলো এই পারিবারিক লাইব্রেরি। একটি লাইব্রেরি একটি জগৎ। অনেক কিছু বোঝায়। অনেক কিছু ঘটায়।

এটাকে তুমি তোমার জীবনের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে নাও। যেমন, কোনো দম্পতি পরিকল্পনা করে– তাদের একটি বেডরুম হবে, একটি ড্রয়িংরুম, একটি...। তাদের এসব পরিকল্পনার সাথে অবশ্যই তাদের এটাও চিন্তা করতে হবে– তাদের জন্য যেন বাসায় একটি রিডিংরুম বা লাইব্রেরি থাকে। এটা কিছুতেই কোনো দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ নয়– নিছক লৌকিকতা বা আলগা আভিজাত্যের প্রকাশও নয়, বরং এটা কোনো বাড়ির মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

লাইব্রেরিটি অনেক বিশাল এবং জৌলুশময় হতে হবে কিংবা নির্ধারিত বিষয়ের সকল বই সেখানে বিদ্যমান থাকতে হবে– এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– সেখানে কত ধরনের বই রয়েছে। এ কারণে তোমার মাথায় বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্পষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। বিশেষ করে রচনাসমগ্রগুলো কেনার চেষ্টা করবে। এই কথাটি শুধু ধনী ব্যক্তিদের জন্যই বলা হচ্ছে না; বরং ধনী-গরিব সকলের জন্য একই কথা।

মানুষ যখন বইয়ের মূল্য অনুভব করতে পারে, নিঃসন্দেহে তখন সে বই ক্রয়ের জন্য তার পারিবারিক খরচ ও পানাহারের মধ্যে কাটছাট করে নিতেও সক্ষম হয়। কিংবা তেমনটি করতেই হয়।

আমরা দেখি– মানুষ কখনো কখনো এক বৈঠকে যে খাদ্য গ্রহণ করে– তার দ্বারা চার-পাঁচটা বই কেনা যায়। সে কখনো শখের বশে এমন একটি জামা বা পোশাক কেনে– যা দিয়ে দশ-বারোটি বই কেনা যায়। আবার কখনো হয়তো সে এক সপ্তাহের আনন্দভ্রমণে বের হয়– যার টাকা দিয়ে শুধু বই নয়– সমীহ করার মতো আস্ত একটা লাইব্রেরিই করে ফেলা যায়।

সুতরাং এই চিন্তাটি যদি তোমার মাথায় থাকে– তবে তুমি গরিব হও আর শ্রমিক, ছাত্র বা শিক্ষক– নিশ্চয় বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের সমাহারে একটি

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক লাইব্রেরি তুমি গড়ে তুলতে পারবেই পারবে। সেখানে সকল প্রকার জ্ঞানের বই থাকবে। প্রত্যেক শ্রেণির অন্তত একটি বই হলেও সেখানে স্থান পাবে। যাতে করে– কোনো বিশেষ বিষয়ে যখন তোমার কোনো বই প্রয়োজন হবে– তখন যেন সেটি তুমি পেতে পারো। তাছাড়া কখনো একটি বিষয় নিয়ে পড়তে পড়তে ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়ে পড়লে– তখন ভিন্ন কোনো বিষয়ের বই হাতে তুলে নিতে পারবে– যার বিষয় ভিন্ন। যার স্বাদ হলো আলাদা।

আরেকটি কথা খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো– তোমার এই গঠিত লাইব্রেরিটি মহান এক 'সদকায়ে জারিয়া' হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, এটি তোমাকে যেমন উপকার করবে, উপকার করবে তোমার সন্তানদেরও। উপকৃত করবে তোমার নাতি-নাতনি, পুতি-পুতা; এমনকি তাদের নাতি-নাতনিদেরও...।

বিশাল এক বংশধারার ওপর লেগে থাকবে তোমার জ্ঞানানুরাগের আলোকে মহিমান্বিত এই ছাপ ও প্রভাব।

৮. পঠিত বিষয় অন্যের কাছে উপস্থাপন করা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, بلغوا عني ولو آية –একটি আয়াতও যদি হয়, তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও।

সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো, সে নিজে যা শিখেছে, অন্যকে তা শেখাবে। নিজে যা জেনেছে, অন্যকে তা জানাবে। এর মধ্যে অনেক উপকার ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যথা :

১. অধীত জ্ঞান আরও ভালোভাবে মাথায় বসে যাবে।
২. তার শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা অন্যকে উপকৃত করতে সক্ষম হবে।
৩. প্রথম শিক্ষাদাতা যে শিক্ষার্থীকে শিখিয়েছে– যে যখন অন্য কাউকে শেখাবে, তখন এর প্রতিদান বা সওয়াব প্রথম শিক্ষাদাতা পাবে– অথচ সেই শিক্ষার্থী থেকে কোনো সওয়াবের কমতি হবে না।
৪. তাছাড়া আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধি দান করবেন।

তুমি সর্বক্ষণ এই হাদিসটির কথা স্মরণ রাখবে–

من عمل بما يعلم أورثه الله علما ما لم يعلم

'যে ব্যক্তি তার জানা অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন ইলম দান করেন, যা সে জানত না।'

তাই যখনই তুমি মানুষকে কিছু শেখাবে, আল্লাহ তাআলা তোমার ইলমের মধ্যে প্রবৃদ্ধি দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আর আল্লাহই তোমাদের শেখান। তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞানী।

৯. পড়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা

পড়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা একটি চমৎকার ফলপ্রসূ বিষয়। এর জন্য তুমি তোমার সাথি-বন্ধুদের নিয়ে একটি 'সাহিত্য আড্ডা'র মতো দল গঠন করে নিতে পারো। তিনজন, চারজন, পাঁচজন কিংবা আরও কিছু বেশি...। এটা হবে শুধুই 'পড়ালেখার দল'। এ ব্যাপারে আগ্রহী ও উদ্যমীরাই শুধু এখানে একত্র হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একটি বিষয় নিয়ে পড়বে। এরপর সপ্তাহে একবার বা দুইবার কিংবা প্রতি দুই সপ্তাহে একবার... নিজেদের সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী একত্রিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই– সে যা পড়েছে অন্যদের সামনে উপস্থাপন করবে। এভাবে খুবই ফলপ্রসূভাবে ও শৃঙ্খলার সাথে জ্ঞাত বিষয়গুলো নিজেদের মাঝে বিনিময় হয়ে যাবে। জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনায় দ্রুত নিজেকে সমৃদ্ধকরণের এটি একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি। এটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

একতাবদ্ধ জ্ঞানের দৃঢ়তা অনেক বেশি। একজন মানুষের দুটো চোখের অধীত জ্ঞানের শক্তি, কিছুতেই এই সমষ্টিগত বহু চোখের পঠিত জ্ঞানের শক্তির সমকক্ষ হয় না– হতে পারে না। একটা মাথার অনুধাবিত বিষয়ের দৃঢ়তা, কিছুতেই তিনটা কিংবা পাঁচটা মাথার অনুধাবিত বিষয়ের দৃঢ়তার সমকক্ষ হয় না– হতে পারে না।

এভাবে তোমাদের প্রত্যেকে একে অন্যকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং পরস্পর পরস্পরকে উপকার ও কল্যাণের পথ দেখাতে পারে।

শয়তান যেখানে তোমাদের একজনের সাথেই পেরে উঠতে সক্ষম হয় না– তাহলে তোমরা দুজন হলে, তখন?

আর যদি তোমরা তিনজন হও... কিংবা পাঁচজন... কিংবা তারচেয়েও বেশি...! তখন?

ঐক্যবদ্ধ শক্তির ব্যাপারটাই অন্যরকম– ব্যাপক সমীহজাগানিয়া। আহা! যদি তোমরা বুঝতে– যদি বুঝত আমাদের জাতি!

১০. আলেমদের থেকে শেখা

৮ম পদ্ধতিটি ছিল– যারা জানে না, তুমি তাদেরকে জানাবে। ৯ম পদ্ধতিটি হলো, পড়ালেখার ব্যাপারে তুমি তোমার ভাই-বোন, সাথি-বন্ধুদের নিয়ে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। আর এখন ১০ম পদ্ধতিটি হলো– তুমি নিজে অন্যের থেকে শিক্ষা অর্জন করবে। শিক্ষা গ্রহণ করবে আলেমদের থেকে, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের থেকে।

তবে অবশ্যই আমাদের পূর্ববর্তীরা যেখানে এসে শেষ করেছেন, তুমি শুরু করবে সেখান থেকে। উদ্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট গিয়ে জেনে নেবে– তুমি কী পড়বে, কোন বই দিয়ে শুরু করবে, এই বিষয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বা ভালো বই কোনটি। যখন কোনো বিষয়ের একটি বই পঠিত হয়ে যাবে, জিজ্ঞাসা করবে এরপর কোনটি পড়বে... এমনি আরও বিভিন্ন বিষয়।

এগুলোর উপকার বলে শেষ করার নয়। জীবনকে পরিপাটিভাবে গঠন করতে হলে এভাবেই করতে হয়। এভাবেই পড়তে হয়। তাছাড়া অনেক মানুষ রয়েছে যারা বই তো পড়ে; কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে এবং এত এত অনুপকারী বই পড়ে তাদের সময় ও শক্তি নষ্ট করে। কিংবা কোনো কঠিন বই নিয়ে গলদঘর্ম হয়– অথচ সে বিষয়ে সহজ ও সুন্দর বইও রয়েছে। কোনো গভীর গহীন বইয়ে মগ্ন হয়ে ডুবে অতল হয়– অথচ সেই বিষয়ে সাবলীল ও সহজিয়া ভাসমান বইও রয়েছে।

অসচেতনতা ও অজ্ঞতার কারণেই এমনটি হয়। তাই যারা পড়েন জানেন এবং খোঁজখবর রাখেন– তাদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখলে জীবনের অনেক সময় ও শ্রম অপচিত হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

আমরা জানি, আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ অবশ্যই তাঁদের পূর্ববর্তী আলেমদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তারা সেখান থেকে শুরু করেছেন, যেখানে তাদের পূর্ববর্তীরা এসে শেষ করেছেন। এভাবেই তারা উপকৃত হয়েছেন এবং অন্যদের উপকৃত করেছেন। শেখার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের অন্বেষণে অন্যের নিকট যেতে এবং অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে তারা কখনোই লজ্জা বা অহংকার দ্বারা আক্রান্ত হননি। সব সময় তারা তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তিদের সামনে বিনয়ী ও বিনম্র থেকেছেন। আদবের সাথে ইলম অর্জন করেছেন। এ সকল মহান গুণ ও চরিত্রের কথা আমাদের পূর্ববর্তী সম্মানিত ইমাম, মর্যাদাবান আলেমদের ক্ষেত্রে ঘটতে দেখি। যেমন ইমাম বোখারি, নববি, আবু হানিফা, ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম...এবং আরও অনেকের ক্ষেত্রে।

তারা ইলমে, জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায়, মর্যাদা ও সম্মানের এমন উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন, অন্যদের থেকে ইলম অর্জন ও বর্ণনা করার মাধ্যমেই। তারা

ঘরে বসে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করেননি। নিজের থেকে কখনো ইলম উৎপন্ন হয় না– হওয়া সম্ভব নয়। তারা ঐশী ইলমের ধারা-ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ইলম অর্জন করেছেন। এরপর এর সাথে আরও যুক্ত হয়েছে...এরপর হয়েছে আরও বিশ্লেষিত ও বিন্যস্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের সাফল্যের পথে পৌঁছিয়েছেন। আর তাদের মাধ্যমে মানবজাতির বিশাল অংশও সরল পথ প্রাপ্ত হয়েছে।

এই হলো দশটি পদ্ধতি। দৃঢ়ভাবে আশা করি– এগুলো তোমাকে এবং যেকোনো মুসলমানকে পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে। সাহায্য করবে পড়ার ওপর অটল থাকতে, মনোযোগী হতে এবং পড়ালেখা থেকে উপকৃত হতে। হ্যাঁ, এটা সত্য যে, উপস্থাপিত দশটি পদ্ধতি ছাড়াও আরও কিছু পদ্ধতি থাকতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে প্রধান ও মৌলিক পদ্ধতিগুলো উপস্থাপন করেছি। একটি জীবনের জন্য এগুলোই যথেষ্ট। আল্লাহই সাহায্যকারী।

কী পড়ব?

পড়াশোনার দশটি মৌলিক বিষয়–

মনে করি, তুমি আগে থেকেই অনুপ্রাণিত ছিলে কিংবা উপরের আলোচনা দ্বারা তুমি ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছ। এখন পড়াকে তোমার জীবনের সঙ্গী বানানোর জন্য তুমি প্রস্তুত। পড়া তুমি শুরু করবেই...; এবং পড়ার ক্ষেত্রে তোমার যে লক্ষ্য তা তুমি সত্যায়িত করেই ছাড়বে। তোমার যে উৎসাহ উদ্যম ও প্রত্যয়– তা তোমাকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যাবেই যাবে। এখন শুধু শুরু করার অপেক্ষা মাত্র...। পড়া সূচনা করার এই সময়টাতে এসে স্বাভাবিকভাবেই তোমার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটি জেগে উঠবে, তা হলো–

আমি কী পড়ব?

আমি তোমাকে বলি, এসো, আমরা একসাথে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি– কোন বিষয়গুলো পড়া যায়, কোন বিষয়গুলো আমাদের পড়া দরকার...।

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে কেউ কেউ হয়তো ধারণা করছ– আমি বোধহয় দীনি ইলম বা ধর্মের বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানগুলো অধ্যয়নের কথাই শুধু বলব। আমি সেই বন্ধুকে বলতে চাই– সে যদি এমনটা ধারণা করে থাকে তাহলে তার জেনে রাখা ভালো, এটা কোনো আদর্শপূর্ণ পাঠ নয়। কারণ, একজন শিক্ষিত মুসলমান হবে ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করবে– যাতে তার মধ্যে একটা নির্ভরযোগ্য ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে– এমনকি আমাদের পড়াশোনা ও পাঠ্য-বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও। দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের মধ্য থেকে যেকোনো উপকারী বিষয়ে পড়াশোনা করা, জ্ঞান অর্জন করা ইসলামের মানদণ্ডে 'উপকারী ও প্রশংসনীয় পড়া' হিসেবেই পরিগণিত ও সমাদৃত।

তবে দুনিয়াতে বিষয়-বৈচিত্রের অভাব নেই। কত বিষয় নিয়েই তো পড়া যায়! কত বিষয় নিয়েই তো মানুষ পড়ে! তবে এখানে আমরা বহু চিন্তা-ভাবনার পর পাঠ্য-বিষয় হিসেবে দশটি বিষয়কে নির্বাচন করেছি। আমাদের জন্য যা কিছু পড়া অপরিহার্য, তা এ দশটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা হলো কেবল প্রাথমিক ধাপ। তবে মৌলিক বিষয়গুলো অনেকটাই এর মধ্যে চলে এসেছে। এরপর আল্লাহ তাআলা যার জন্য সহজ করে দেবেন, সে আরও পড়বে, আরও জানবে।

যথাক্রমে সেই দশটি মৌলিক পাঠ্যবিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে–

১. কোরআনুল কারিম

প্রথমে আমরা যা পড়ব... সর্বশ্রেষ্ঠ যা আমরা পড়ব... সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দ-বাক্য আমরা পড়ব– তা হলো কোরআনুল কারিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পবিত্র বাণী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠ্যবিষয়।

কোরআনুল কারিম নিছক এমন কোনো গ্রন্থ নয় যে, দু-একবার পড়ে রেখে দেওয়া হবে। কোরআনুল কারিম হলো, মানবকুলের জীবনযাপনের সংবিধান। তাই এটি পাঠ করতে হবে বারবার, পড়তে হবে অব্যাহতভাবে, পড়তে হবে জীবনের প্রধানতম একটি কাজ হিসেবে। এমনকি আলেমরা বলেন, একজন মুসলমানের ওপর অন্তত মাসে একবার পুরো কোরআন তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা আবশ্যক– কিংবা এর চেয়েও কম সময়ে। এ জন্য তোমার দৈনন্দিন রুটিনে কোরআনের জন্য একটা বিশেষ অবস্থান থাকা অপরিহার্য।

যদি তুমি এমনটা করতে পারো– তাহলে তোমার দৈনন্দিন কর্মসমূহে অবশ্যই কোরআনের একটা স্পষ্ট প্রভাব থাকবে। একটা অন্যরকম ঐশী আলোয় আলোকিত থাকবে তোমার হৃদয় ও মন।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। অনেক মানুষকে দেখা যায়– তারা জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন, পড়াশোনা ও চর্চাকে প্রাধান্য দেয়– কিন্তু কোরআনুল কারিম পাঠ করে না। এ তো খুবই ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক এক অপরাধ। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কিতাব প্রদানের মাধ্যমে আমাদের প্রতি কতটা অনুগ্রহ করেছেন! যে কিতাবটি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জন্য পাঠ করা ছিল আবশ্যক, অপরিহার্য। অথচ সেই কিতাব পাঠেও তিনি আমাদের উৎসাহিত করেছেন– পঠিত প্রতিটি হরফের বিনিময়ে সওয়াব প্রদানের ঘোষণা দিয়ে। এরপর অবস্থা অনুযায়ী এই সওয়াব আরও বৃদ্ধি করেছেন দশগুণ পর্যন্ত! ...

আমাদের জন্য বড় ব্যতিক্রম সুসংবাদ হলো, কোরআনের প্রতিটি হরফের বিনিময়ে সওয়াব প্রদান করা। অথচ একটিমাত্র হরফে কোনো অর্থ দাঁড়ায় না। বরং সেটিকে অন্য হরফের সাথে সংযুক্ত করে শব্দে রূপান্তরিত করলেই শুধু তার অর্থ হয়। হতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা প্রতি শব্দে একটি করে সওয়াব দেবেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর অসীম অনুগ্রহের ফলে শব্দ নয়; মাত্র একটি হরফের ওপরই সওয়াব প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রতিটি হরফে বা বর্ণে সওয়াব প্রদানের এই বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের মাধ্যমেও সত্যায়িত হয়েছে– যাতে এটাকে অন্য

কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত না করা হয়। তিরমিজি শরিফে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় এসেছে–

عَبْدُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাব কোরআন থেকে একটি হরফ বা বর্ণ পড়বে, সে এর বিনিময়ে একটি সওয়াব পাবে এবং এই সওয়াব দশগুণে বৃদ্ধি হবে। আমি বলি না যে ?? তিনটি মিলে একটি হরফ; বরং ا একটি হরফ, ل একটি হরফ এবং م একটি হরফ।

সুতরাং সর্বপ্রথম পড়া বা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যাকে প্রাধান্য দেব তা হলো, কোরআনুল কারিম– আল্লাহর বাণী।

২. হাদিসুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দ্বিতীয় পাঠ্যবিষয় হবে– হাদিস পাঠ। এটাও আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের বাস্তবতা হলো, এর অনেক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এবং কোরআনের পর এটা ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হওয়া সত্ত্বেও– এ দিকে আমরা গুরুত্ব খুব কমই দিয়েছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ প্রদান করেছেন 'جو?مع ?لكلم' অর্থাৎ তাঁর কথা সংক্ষিপ্ত– কিন্তু এর অর্থ অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। আমাদের সামনে কত হাদিস– হাদিসের কত কিতাব! এগুলোর মধ্যে একটি ছোট সংক্ষিপ্ত হাদিসও যদি পাঠ করা হয়– তাতেও আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় অকল্পনীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও হিকমত।

আমাদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত কোরআন পাঠ করে। কিন্তু খুব কম লোকই আছে– যাদের দু'চোখ ও মস্তিষ্ক আল্লাহর হাবিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস পাঠের আনন্দে পরিতৃপ্ত হয়। কেউ যদি পড়েও- এলোমেলোভাবে, অগোছালোভাবে পড়ে। আমরা চাই, হাদিসে নববির পাঠ হয়ে ওঠুক তোমার জীবনের প্রধান কর্মসমূহের একটি।

নববি হাদিস থেকে তুমি যদি দিনে একটি কিংবা দুটি হাদিসও অর্থসহ নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করো, অচিরেই তোমার অর্জনের ভাণ্ডার আকাশ স্পর্শ করবে। আমাদের সামনে জ্ঞানের যত ভাণ্ডার রয়েছে, এর মধ্যে হাদিস হলো একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার। আলহামদুলিল্লাহ– আমাদের সামনে হাদিসের অনেক কিতাব রয়েছে। তুমি এর একটি ছোট পুস্তিকা দিয়েই শুরু করো না

কেন– ধীরে ধীরে হোক, তবুও অব্যাহত থাকুক। যেমন ইমাম নববি রহ.-এর 'চল্লিশ হাদিস' দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। এরপর 'رياض الصالحين'-রিয়াজুস সালেহিন' কিতাব ধরতে পারো। এটাও ইমাম নববি রহ. কর্তৃক সংকলিত। এরপর পড়তে পারো 'اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان'। আর পড়তে পারো 'مختصر البخاري... و مختصر مسلم'...

কিতাব যেটাই হোক– গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তোমার পড়তে শুরু করা এবং পড়া অব্যাহত রাখা।

৩. ধর্মের বিধি-বিধান

পাঠের তৃতীয় বিষয় হবে ধর্মীয় বিধি-বিধান, মাসআলা-মাসায়েল। বর্তমান সময়ের এবং পূর্ববর্তী আলেমদের থেকে এগুলো অর্জন করতে হবে। গ্রন্থ থেকে এবং ব্যক্তি থেকে শিখতে হবে। ইসলামি শরিয়তের জ্ঞানগুলো সুষ্ঠুভাবে অর্জন করার ক্ষেত্রে তুমি একটি পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে পারো। যেহেতু জ্ঞানের এই ভাণ্ডারটি অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। তুমি তোমার ইচ্ছামতো প্রতিটি বাগান থেকে এই সৌরভময় জ্ঞানের ফুল আহরণ করতে পারো। প্রাথমিকভাবে ইসলামি জ্ঞান-শাখাগুলোর প্রতিটি শাখার অন্তত একটি প্রধান কিতাব পড়ে নেবে। আশা করা যায়– এগুলো তোমাকে একটি চমৎকার পটভূমি বা সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। তোমাকে উপহার দেবে মৌলিক জ্ঞানের এমন একটি কাঠামো, যার ওপর ভিত্তি করে অচিরেই তুমি বিশাল জ্ঞানভবন তৈরি করতে সক্ষম হবে– ইনশাআল্লাহ। প্রথমে কোনো ছোট পুস্তিকা দিয়েই শুরু করো; এরপর ধীরে ধীরে সময় ও মেধার পরিপক্বতার সাথে বড় ও বিস্তৃত কিতাব পাঠের দিকে ধাবিত হবে।

এখানে কিছু কিতাবের তালিকা প্রদান করা হচ্ছে। আশা করি, এগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে তোমার একটি শক্তিশালী ভিত্তি দাঁড়িয়ে যাবে।

১. مختصر تفسير ابن كثير [সংক্ষিপ্ত তাফসিরে ইবনে কাসির]

কোরআনুল কারিমের তাফসিরের ক্ষেত্রে এ হলো একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। চমৎকার উপস্থাপনা ও সরল বর্ণনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের অনন্যতা সর্বজনস্বীকৃত। তুমি এই গ্রন্থের ত্রিশ নম্বর পারার 'আম্মা ইয়াতাসাআলুন' থেকে শুরু করতে পারো। এরপর যে সুরাগুলো তোমার মুখস্থ রয়েছে, এক এক করে সেগুলোর তাফসির অধ্যয়ন করে নিতে পারো। যেমন– সুরা বাকারা, কাহাফ, ইয়াসিন, ওয়াকিয়া। এক্ষেত্রে একটি পাঠ-তালিকা তৈরি করে নাও। এরপর এটিকে অব্যাহত রেখে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলো।

২. 'إعلاء السنن'– ইলাউস সুনান।

এর প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজের বিধানাবলি সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা যেভাবে এই ইবাদতগুলো পালন করার আদেশ করেছেন, ইবাদতগুলো সেভাবে আদায় করার জন্য এই কিতাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. 'كتاب الإيمان'– কিতাবুল ইমান।

এই গ্রন্থটির লেখক ড. মুহাম্মদ নাইম ইয়াসিন। ইসলামি আকিদা বিষয়ে এটি খুবই সহজ ও বিস্তৃত একটি কিতাব। সম্মানিত লেখক এখানে অতি চমৎকারভাবে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল এবং আখেরাত বিষয়ে ইমানের ধরন ও অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহর নির্ধারণ ও তাকদিরের প্রতি ইমান আনার ধরন ও অবস্থা সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন।

৪. 'مختصر منهاج القاصدين' সংক্ষিপ্ত মিনহাজুল কাসিদিন।

হৃদয়ের বিশেষ অবস্থা, আধ্যাত্মিকতা, অন্তরের রোগ এবং সেগুলোর নিরাময়ের ধরন সম্পর্কে অতি চমৎকার ও উপকারী একটি কিতাব। এছাড়া এখানে মানব-চরিত্রের কিছু খারাপ দিক এবং সেগুলোর ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে– যেমন:- রাগ, কৃপণতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও গীবত..। তাওবার স্বরূপ সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। আরও আলোচনা রয়েছে– কীভাবে তুমি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাকে কীভাবে ভালোবাসে– সে সম্পর্কে। আবারও বলি, বাস্তবেই এটি একটি সুন্দর ও উপকারী কিতাব।

৫. 'كتاب خلق المسلم'– মুসলমানের চরিত্র।

বইটির লেখক ইসলামি ইতিহাসের বিখ্যাত সংস্কারক ও তুলনাহীন দার্শনিক ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। প্রতিটি মুমিনের জন্য মৌলিক চরিত্র বা চারিত্রিক গুণাবলি বোঝার ক্ষেত্রে এটি একটি অসাধারণ কিতাব।

৬. 'المرأة في التصور الإسلامي'– ইসলামি সমাজ পরিকল্পনায় নারীর অবস্থান।

বইটির লেখক ড. আবদুল মুতাআল আল জাবরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এতে খুবই চমৎকার ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ইসলামে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা বিষয়ে এবং এ বিষয়ে ইসলাম সম্পর্কে যে সকল সন্দেহ ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়– সেগুলোর উত্তরও দিয়েছেন অতি চমৎকারভাবে। নারী বিষয়ে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী একটা বই। তাছাড়া এটা শুধু মহিলাদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়; পুরুষদের জন্যও এর গুরুত্ব সমানভাবে প্রযোজ্য।

৭. 'الرحيق المختوم' – আররাহিকুল মাখতুম।[১]

বইটির লেখক শাইখ মুবারকপুরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে নিয়ে ওফাত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনকে সহজ বর্ণনা ও সুন্দর বিন্যাসের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি যদি তুমি অধ্যয়ন করো– তবে তুমি সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সর্বশেষ রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সম্পর্কে একটি ক্ষুরধার চিন্তা ও প্রেরণা ধারণ করতে সক্ষম হবে।

৮. 'صور من حياة الصحابة' – সাহাবিজীবনের খণ্ডচিত্র।

গ্রন্থটির লেখক বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। অনেক সাহাবির জীবন সম্পর্কে এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ। বিশেষ করে এর সৌকর্যময় ভাষা, সাবলীল বর্ণনা এবং ব্যাপক জ্ঞানসমৃদ্ধ হওয়ার কারণে একটি অনন্যসাধারণ কিতাবে পরিণত হয়েছে। সমাদৃত হয়েছে পুরো আরব বিশ্বে এবং অন্যান্য দেশেও।[২]

৯. 'ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين' মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো।

বইটির লেখক বিংশ শতাব্দীর 'শেষ সূর্য' বলে খ্যাত ইসলামি ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, দাঈ ও চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব। এতে ইসলামপূর্ব অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অবস্থার বিশদ বর্ণনা এসেছে এবং মানুষের সেই অনাচারী বোধ-বিশ্বাসকে ইসলাম কীভাবে পরিবর্তন করল এবং সংশোধন করল– সে বিষয়েও সুন্দর ও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যদিও তিনি একজন অনারব– কিন্তু এ বিষয়ে আরবিতে তাঁর বইটি সত্যই অনন্য। বইটির নামের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়– তিনি যদি কিছুটা পরিবর্তন এনে 'انحطاط المسلمين' এর স্থানে 'تأخر المسلمين' লিখতেন, তাহলে বোধ হয় ভালো হতো। তবে এটি ভিন্ন কথা। সামগ্রিকভাবে বইটি অতি চমৎকার ও অসাধারণ।[৩]

১০. 'من روائع حضارتنا'– আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কাজগুলো।

১.বইটি একাধিক প্রকাশনী থেকে বাংলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

২. বিশ্বব্যাপী সমাদৃত এই বইটি বাংলায় 'সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী' নামে প্রকাশ করেছে রাহনুমা প্রকাশনী।

৩.বইটির প্রথম অনুবাদ করেছেন আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.। আরেকটি চমৎকার অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ [মা.জি.]। দারুল কলম থেকে প্রকাশিত।

বইটির লেখক ড. মুস্তফা আসসিবায়ী রহমাতুল্লাহ আলাইহি। ইসলামি সভ্যতার শোভা সৌন্দর্য ও সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে উন্নতি, অগ্রগতির শীর্ষচূড়ায় উপনীত হয়েছিল– সে সম্পর্কে এ যাবৎ যত কিতাব লেখা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এই কিতাবটি সর্বসেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

এছাড়া হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে আরেকটি কিতাব পড়তে পারো– কিতাবটির নাম: 'جامع العلوم والحكم' কিতাবটির লেখক ইবনে রজব হাম্বলি। এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঞ্চাশটিরও বেশি হাদিস খুবই চমৎকার উপস্থাপনা ও বিন্যাসের সাথে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এমনিভাবে 'كتاب العبادة في الإسلام' কিতাবটিও পড়া যায়। কিতাবটির লেখক ড. ইউসুফ কারজাবি। ইসলামে ইবাদতের অর্থের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এবং সেগুলো জীবনের সকল কর্মকে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে বইটির অনন্যসাধারণ গভীরতা রয়েছে।

এখানে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু কিতাবের উদাহরণ প্রদান করা হলো। নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রয়েছে। সেগুলোও পড়া যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো– তোমার পড়তে শুরু করা।

আবার স্মরণ করিয়ে দিই– কোরআন ও হাদিসের পর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবিষয় হলো ধর্মীয় জ্ঞান বা বিধি-বিধান অধ্যয়ন।

৪. পাঠ্যবিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন

শিক্ষাজগতের একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা সত্ত্বেও আমি অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষ করে ছাত্রদের– এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও দেখি, তারা এ ব্যাপারে খুবই কম গুরুত্ব দেন। নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের বিকল্প নেই– হোক ধর্মীয় বিষয় কিংবা পার্থিব বিষয়। এর জন্য পড়াকে অব্যাহত রাখা জরুরি।

কেউ যদি পার্থিব কোনো বিষয়েও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে চায়– তাহলেও তাকে সে বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে। একজন চিকিৎসককে অবশ্যই তার চিকিৎসা বিষয়ে গভীর পড়াশোনা করতে হবে। একজন ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলী নিশ্চয় তার ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশল বিদ্যা সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন। একজন পদার্থবিদকে পড়তে হবে তার পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে। একজন ভূগোলবিদ পড়বেন ভৌগোলিক বিদ্যা..... এভাবে সকলেই তার নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করবেন বা করতে হয়।

তাহলে তুমি কেন নও তোমার বিষয়ে?

সুতরাং তুমি ঠিক যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে চাও– সে বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করো। সময়ের সবচেয়ে আধুনিকটা পড়ো। তোমার মানসিক শক্তিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করো। বাড়িয়ে তোলো তোমার সাহস, সক্ষমতা ও সম্ভাবনা। জেনে রাখো, সকল সূচনার আগে তোমার এই মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তাই সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমরা চাই– সকলেই তার নিজস্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুক। আমরা কখনোই চাই না যে, একজন ইঞ্জিনিয়ার তার ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে ফিকাহশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুক। কোনো পদার্থবিজ্ঞানী তার পদার্থবিদ্যা ছেড়ে দিয়ে তাফসিরশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার চেষ্টা করুক। ঠিক একইভাবে ধর্মীয় কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন নেই অভিজ্ঞ প্রকৌশলী হয়ে ওঠার। বরং আজ আমাদের শরিয়তের বিশেষজ্ঞ আলেমের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে প্রয়োজন 'জীবন' সম্পর্কে জ্ঞাত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের, বিজ্ঞানীদের।

আমাকে একবার বিজ্ঞান অনুষদ থেকে একটি বিদায়ী ব্যাচের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়। আমি সেখানে উপস্থিত হলে উপস্থিত কর্তাব্যক্তিরা আমার নিকট আবেদন জানালেন– আমি যেন বিদায়ী শিক্ষার্থীদের এমন কিছু মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিই– যা তাদের আসন্ন কর্মজীবনে সাফল্য ও উন্নতির পক্ষে সাহায্যকারী হবে...।

বক্তব্য দিতে গিয়ে আমি বললাম, বন্ধুগণ! আমি প্রাথমিকভাবে এটুকু স্বীকার করছি যে, তোমরা এখন নিজেদের বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, টাকা-পয়সা অর্জন করবে, বিয়েশাদি করবে... হ্যাঁ, এগুলো তো করবেই। নিঃসন্দেহে এগুলোও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ থাকবে– তোমরা তোমাদের জ্ঞানের পথে এই যাত্রাকে আরও পরিপূর্ণ করে নাও। তোমাদের নিজ নিজ বিষয়ে তোমরা আরও দক্ষতা, উন্নতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করো। তোমাদের সকলেরই উচিত, মাস্টার ডিগ্রি ও ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা। কেনইবা করবে না? যারা এই সম্মানজনক ডিগ্রিগুলো অর্জন করে, তারা কি ইসলামের ক্ষেত্রে যারা ধার্মিক, তাদের থেকে আলাদা হয়ে পড়ে? দীন বা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে? ...না। বরং বিষয়টা এর উলটো। স্বাভাবিকভাবেই– একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলিমের জ্ঞানের প্রতি সবেচে বেশি আগ্রহী ও উৎসুক হবার কথা। তিনি এই জ্ঞানের অন্বেষণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করবেন। যেমন:- তিনি পৃথিবীতে ইসলামের পক্ষে নেতৃত্বের

কামনা করেন, মানুষের কল্যাণ চান এবং মানবতার সেবা করতে আগ্রহী। এগুলো তো মুমিনদেরই কাজ!

৫. ইতিহাস পাঠ

ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি তোমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছি। আবারও বলছি– ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোরআনুল কারিমের এক তৃতীয়াংশ আলোচনার বিষয়ই হলো ইতিহাস। এই বিশাল অংশ জুড়ে পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে?

উদ্দেশ্য স্পষ্টঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করা। আল্লাহর জমিনে তাঁর সৃষ্টজীব ও মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতি ও পদ্ধতি বোঝার চেষ্টা করা।

সামগ্রিকভাবে সকল ইতিহাসই গুরুত্বপূর্ণ। তবুও এখানে কিছু অগ্রগণ্যতার বিষয় রয়েছে। কারণ, বর্তমান পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস কোনো মানুষের পক্ষে অধ্যয়ন তো দূরে থাক– শুধু পড়ে শেষ করাও সম্ভব নয়। তাই প্রাধান্যতার ভিত্তিতে আমাদের ইতিহাসের প্রধান অংশগুলো নির্বাচন করে নিতে হবে।

আমাদের ইতিহাস পাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত– তাঁর জীবন-ইতিহাস। এরপর সম্মানিত চার খলিফার ইতিহাস। এরপর ইসলামের অন্যান্য ইতিহাস। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ, ব্যক্তি, সংগ্রাম-আন্দোলনের ইতিহাস।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-ইতিহাস বিষয়ে প্রাথমিক পাঠ হিসেবে তুমি আল্লামা মোবারকপুরীর 'الرحيق المختوم' কিতাবটি পড়তে পারো– যার কথা কিছুক্ষণ আগেও বলেছি। বইটিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে ইনতেকাল পর্যন্ত সুন্দর বিন্যাস ও বিস্তৃতির সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এরপর সিরাতের অন্যান্য কিতাব থেকে সাহায্য নিতে পারো– যেমন, سيرة إبن هشام -সিরাতে ইবনে হিশাম, فقه السيرة - ফিকহুস সিরাহ [আল্লামা বুতি], فقه السيرة- ফিকহুস সিরাহ [মুহাম্মাদ গাজালি]।[৪] এছাড়া সিরাত বিষয়ে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রয়েছে– সেগুলো পড়তে পারো।

---

[৪] বাঙলাভাষী পাঠকদের জন্য এ বিষয়ে অসাধারণ একটি গ্রন্থ হলো মাকতাবাতুল বায়ান প্রকাশিত *ফিকহুস সিরাহ*।

ইতিহাসের আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– চার খলিফার ইতিহাস। এই বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য পড়তে পারো 'إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء' - ইতমামুল ওফা ফি সিরাতিল খুলাফা'। বইটির লেখক আল্লামা খযরি এবং সাথে সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সাহাবিদের সম্পর্কেও তোমাকে পড়তে হবে গুরুত্ব দিয়ে। এক্ষেত্রে সূচনা হিসেবে পড়া শুরু করতে পারো 'صور من حياة الصحابة' কিতাবটি দিয়ে। বইটির লেখক আবদুর রহমান রাফাত পাশা। এর কথাও আগে বলা হয়েছে।

এছাড়া ইসলামি ইতিহাসের ক্ষেত্রে আরও কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্রসম কিতাব রয়েছে। যেমন, 'ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين' মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো। লেখক, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

আরেকটি বই হলো, ' من روائع حضارتنا ' আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কাজগুলো। বইটির লেখক ড. মুস্তফা আসসিবায়ী রহমাতুল্লাহ আলাইহি।

এ বিষয়ে আরেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হলো, 'حماة الإسلام' লেখক, মোস্তফা নাজিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

এই কিতাবগুলো খুবই চমৎকার। নিশ্চিত, এগুলো তোমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়িয়ে দেবে। তোমার চোখের সামনে খুলে দেবে মানুষ ও পৃথিবীর অনেক পাঠ ও দরজা।

স্মরণ রাখা উচিত! তুমি তোমার শত্রুদের মোকাবেলা করবে তাদের চেয়েও আরও শানিত ও ক্ষুরধার মাধ্যমে... অন্তত সমশক্তি দিয়ে তো অবশ্যই। তাই– পড়া ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই।

৬. বিশ্বের বিভিন্ন চলমান ঘটনা পাঠ

এই বিষয়টিও অনেক গুরুত্বের দাবি রাখে। বরং বর্তমান সময়ে একজন সচেতন ও সুসভ্য মুসলমানের জন্য এটি অপরিহার্য বিষয় বলা যেতে পারে। ঘটমান ঘটনা বলতে আমি বোঝাতে চাই– আমরা ঠিক যেই সময়টাতে অবস্থান করছি, সেই সময়ের চারপাশের ঘটিত বিষয় ও তার কারণগুলো। যেমন:- বর্তমান রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান। এগুলো হতে পারে তোমার নিজের দেশের, মুসলিম-বিশ্বের এবং সামগ্রিকভাবে পুরো বিশ্বের– সকল বিষয়ে মৌলিকভাবে খোঁজ-খবর রাখা।

আজকের পৃথিবীর পরিবর্তিত যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি– নিশ্চয় এটা মুসলিম উম্মাহর ওপরও বিরাট প্রভাব রাখে। তুমি নিজেও যখন মুসলিম উম্মাহর সার্বিক

গঠনে ও উন্নয়নে কাজ করতে চাও, তাহলে তোমাকে জানতেই হবে– তোমার দেশ ও চারপাশের পৃথিবীতে ঘটিত ঘটনাগুলো। জানতে হবে নেপথ্য কারণগুলোও...।

রাজনীতি বা তার আলোচনা নিষিদ্ধ, হারাম বা ভালো নয়– এ কথা এখন বাসি হয়ে গেছে। এখন আর এ কথার কোনো মূল্য নেই। কথাটিকে মানুষদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করার বিভ্রান্তিকর সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

অতএব, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, কৃষি, যুদ্ধ এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক ও দেশীয় চুক্তি– এগুলোর কোনোটিই ইসলামের কর্ম-আওতার বাইরে নয়। নিশ্চয় এগুলোর মধ্যে ইসলামের দিকনির্দেশনা রয়েছে। এগুলো কীভাবে সম্পাদিত হবে বা হওয়া উচিত– নিশ্চয় ইসলামে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে।

অথচ ইসলামের কোনো কোনো প্রচারক, পণ্ডিত এগুলোর ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন না, প্রতিফলে তারা বর্তমান মানুষের জীবন ও তাদের ঘটনাবলি থেকে ছিটকে পড়েন এবং দূরে সরতে থাকেন। আর এ কারণে তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে মানুষদের মাঝে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেন না, তাদেরকে পরিবর্তনও করতে সক্ষম হন না।

বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাববার সময় এসেছে... কিংবা ভাববার সময় অতিদ্রুত অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

যাহোক, সংবাদ জানার জন্য তুমি প্রতিদিনের দৈনিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নেবে। খবরগুলো সংক্ষেপে জেনে নেবে। সরকারি বা বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রগুলোও দেখে নেবে। খবরগুলো হতে পারে শহরের, গ্রামের, হতে পারে ইসলামের কিংবা ইসলামের বাইরের। হতে পারে আরবি কিংবা অনারবি।

আর বৈশ্বিক ঘটমান ঘটনাগুলো জানার জন্য তুমি শুনতে পারো BBC ও CNN। কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের ঐচ্ছিক কিংবা অজ্ঞতাপূর্ণ বিভ্রান্তিগুলো থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। বিভিন্ন সময় সাম্প্রতিক বিষয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের নিয়ে তাদের অনেক রকম প্রোগ্রাম হয়। সেসকল প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানে শরিক হওয়ার চেষ্টা করতে পারো।

সতর্কতার সাথে– চোখকান খোলা রেখে এভাবে যদি কিছুদিন তোমার পাঠ চালিয়ে নিতে পারো– অবশ্যই তোমার মাঝে এমন একটি সূক্ষ্ম ও শানিত বোধের সৃষ্টি হবে– যা দ্বারা তুমি নিজেই সঠিক ও বেঠিকের মাঝে, বাস্তব ও মিথ্যা প্রচারণার মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়ে ওঠবে।

৭. অন্যদের মত-অভিমত ও মন্তব্যগুলো পড়া

খুবই আফসোসের কথা যে, আমাদের অনেকেই অন্যের মত বা মতামত পড়তে বা শুনতে প্রস্তুত নন। তিনি যে চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত, এর বাইরে কোনো মুসলমান পণ্ডিতের লেখা পড়া ও কথা শোনার জন্যও প্রস্তুত নন। আর যারা প্রকৃতই ইসলামি চিন্তাধারার মানুষ নয়– তাদের লেখাপড়া তো আরও অনেক দূরের বিষয়। কেন আমাদের মাঝে এই সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা! অথচ আমরা জানি, জ্ঞান হলো, মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই তা পাওয়া যাবে, সকল মানুষের চেয়ে সেই তার প্রতি বেশি হকদার।

আহা! কোথায় এই বাণী, আর কোথায় আমরা!

বরং অন্যরা কী বলে, সেগুলোও আমাদের পড়া প্রয়োজন। আমাদের জানতে হবে– তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, তাদের মতগুলো কী এবং এক্ষেত্রে তাদের যুক্তিগুলোই বা কী। নিজের চিন্তায় নিজেকে পরিশুদ্ধ ভেবে সংকীর্ণ হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়।

তাছাড়া আমাদের যারা চিন্তায় পরিপক্ব– অনৈসলামিক কোনো চিন্তাধারা নিয়েও তাদের পড়া উচিত। সেখানে অনেক মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তিও রয়েছেন, যাদের অনেক অনৈসলামিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মত ও মন্তব্য রয়েছে– যুক্তিতে যেগুলো বাহ্যত শক্তিশালী, বুদ্ধিবৃত্তিক, মূল্যবান, অসাধারণ এবং দেশাত্ববোধে অনুপ্রাণিত। এছাড়া তাদের কারও কারও অনেক উন্নত সাহিত্যপূর্ণ ও উপকারী রচনাও রয়েছে– যেগুলোতে হয়তো শুধু ব্যক্তিক উন্নতি-অগ্রগতি, সুখ-দুঃখ ও সামাজিক কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এগুলোও আমাদের পড়া প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন– কীভাবে তারা এত ভালো লেখে? কীভাবে তারা চিন্তা করে? আর তাদের গবেষণা প্রবন্ধগুলোই বা কী নিয়ে এবং কেমন?

আমি তো আরেকটু সামনে বেড়ে বলতে চাই– অমুসলিমদের লেখাও আমাদের প্রাজ্ঞদের পড়া প্রয়োজন। আমাদের জানা প্রয়োজন– কীভাবে ইহুদিরা চিন্তা করে, কীভাবে চিন্তা করে খ্রিষ্টানরা, কীভাবে চিন্তা করছেন অতীত ও বর্তমানের বহু পণ্ডিত, আলেম, পূর্ব ও প্রাচ্যের সাহিত্যিক ও কবিগণ। পড়া প্রয়োজন নিক্সনের কথাগুলো। জানতে হবে এই সময়ে কী বলছে বুশ, ক্লিনটন, ডেভিড কোক...এবং অন্যরা। আমাদের ক্ষেত্রে তাদের পর্যবেক্ষণটা কী– তা আমাদের জানতে হবে।

[বর্তমানে– যেমন, ট্রাম্প, নেতানিয়াহু, মোদি, পুতিন, এরদোগান, রোহানি, তেরেজা মে প্রমুখ]

জানতে হবে– কীভাবে তারা তাদের দেশ পরিচালনা করছে, কীভাবে তারা আমাদের সাথে লড়াই করছে কিংবা চুক্তি করছে। এগুলো খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। এগুলো জানার জন্য আমাদের প্রতিদিনের ব্যস্ততা থেকে সময় বের করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে।

এভাবে অব্যাহতভাবে যদি আমরা অন্যদের লেখা পড়তে এবং কথা শুনতে থাকি– নিঃসন্দেহে আমাদের জানার পরিধি অনেক বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মাথায় সবসময় এই কথাটি থাকা উচিত–

بداية أن يسمع لك غيرك.. أن تسمع أنت له

প্রথমে– তুমি কাউকে কিছু শোনানোর চেয়ে তুমিই বরং অন্যেরটা আগে শোনো।

৮. ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার এবং প্রতিরোধ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের নামে কত অপপ্রচার যে চালানো হয়েছে... ইসলামের ব্যাপারে কত সন্দেহ যে সৃষ্টি করা হয়েছে– তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই!

আমরা তো জানি ও বিশ্বাস করি এবং দৃঢ়তা রাখি– ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দীন বা ধর্ম, এর মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি বা ভুল নেই। কেননা, এটি প্রদান করা হয়েছে সমস্ত জাহানের প্রতিপালক, রক্ষক ও সৃষ্টিকারী মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। কিন্তু অনেক সময় আমরা অন্যদের ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহ ও অভিযোগগুলোর সন্তুষ্টিমূলক এবং তৃপ্তিদায়ক উত্তর দিতে সক্ষম হই না। তাছাড়া আমরা নিজেরাই তো আমাদের চারপাশের কত সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে অতি অজ্ঞ– অথচ আমরা এর মাঝেই রয়েছি, এর ওপরই চলেছি।

অতীতের তুলনায় বর্তমানে আমাদের মহান ধর্ম বা ইসলামের ব্যাপারে অন্যদের সন্দেহ সৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে... এ জন্য বহু ষড়যন্ত্রকারী এজেন্ট সংগঠিত হয়েছে, প্রচুর সম্পদ খরচ করছে, বহু শক্তি ও ক্ষমতা জমা করছে। তাই অতীতের তুলনায় আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হবে– এই সন্দেহ ও অভিযোগগুলোর প্রত্যুত্তর প্রদান করা। পাল্টা যুক্তির মাধ্যমে তাদের যুক্তিগুলো খণ্ডন করা। প্রশ্নের ওপর তুলে ধরা আরও কিছু পাল্টা প্রশ্ন...

যেমন...

ইসলামে নারীর অবস্থান কী?

যারা বলে, ইসলামে কেন জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে, কীভাবে তাদের এই আপত্তির জবাব দেব।

যারা বলে, ইসলামের হদগুলো [দণ্ডবিধান] প্রয়োগ হলে– ইসলাম শুধু আমাদের একটি প্রতিবন্ধী ও কর্তিত হাতের জাতি উপহার দেবে– এই অভিযোগই বা খণ্ডানো যাবে কীভাবে?

যারা বলে, ইসলাম হলো একটি ভীতিপ্রদ, কঠিন, স্থবির ও পশ্চাৎপদ ধর্ম– কীভাবে খণ্ডন করা হবে তাদের এই অভিযোগ?

তাছাড়া অভিযোগ উত্থিত হয় সিরাত সম্পর্কে, প্রিয়নবির জীবন সম্পর্কে, কোরআন, হাদিস ও ইসলামের বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কেও– প্রশ্নগুলোর তৃপ্তিদায়ক উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি?

এ ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ ও সন্দেহ আমাদের চারপাশে ছড়ানো হচ্ছে বাহ্যত খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায়, যৌক্তিক সৌন্দর্যে শক্তিশালী পদ্ধতিতে এবং আপাত তৃপ্তিদায়ক কৌশলে...।

এখন কথা হলো– এগুলোর তৃপ্তিদায়ক উত্তর দিতে হলে আমাদেরও শিখতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে কালের ভাষা ও পদ্ধতি, জানতে হবে যুক্তি ও প্রযুক্তি। তুমি হবে ইসলামের দাঈ ও প্রচারক– এগুলো না জেনেই?

এক্ষেত্রে আমরা কোন বইগুলো পড়তে পারি?

এই বিষয়ে আমরা সাহায্য নিতে পারি শাইখ মুহাম্মদ কুতুব লিখিত 'شبهات حول الإسلام' -'ইসলাম সম্পর্কে আরোপিত সন্দেহসমূহ' কিতাবটি।

এরপর পড়তে পারি 'حقائق الإسلام وأباطل خصومه' ইসলামের অধিকার ও তার সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ।

আরও পড়া যায় ড. শাওকি আবু খলিল লিখিত 'الإسلام في قفص الاتهام' - ইসলামের ওপর আরোপিত আপত্তি।

এগুলো ছাড়াও এ ব্যাপারে আরও অনেক লেখকের সুন্দর সুন্দর কিতাব রয়েছে। ব্যাপক জানাশোনার জন্য সেগুলোও পড়া যেতে পারে।

৯. শিশুবিষয়ক লেখা পাঠ

আমাদের অনেকেই হয়তো ভাবিই না–বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে। তাদেরকে সুন্দর জীবনের দিকে পরিচালিত করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে ভাবার ও যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অথচ তারাই আমাদের আগামী প্রজন্ম– অনাগত ভবিষ্যৎ।

বাচ্চাদের গঠন-লালন সম্পর্কে অনেক কিতাবই পাওয়া যায়। যেমন, আবদুল্লাহ নাসেহ উলওয়ান লিখিত 'تربية الأولاد في الإسلام'। এছাড়াও অনেক অভিজ্ঞ

লেখক বাচ্চাকাচ্চা লালন-পালন সম্পর্কে বই লিখেছেন। সেগুলো আমরা পড়তে পারি। তারা লিখেছেন– বাচ্চাদের বিভিন্ন মানসিকতা, তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে। তাদের মানসিক বিকাশ ও গঠন সম্পর্কে।

এছাড়া 'বাচ্চাদের ঘটনা'-জাতীয় লেখাগুলোও আমাদের পড়া উচিত– যাতে করে আমরা আমাদের মজলিসে, মসজিদে এবং বাড়িতে তাদের ওপর প্রভাবসৃষ্টিকারী ঘটনাগুলো উপস্থাপন করতে পারি। তাদের নিকট এমন ঘটনা ও কাহিনি উপস্থাপন করি– যা তাদেরকে দীনি মজলিসে যেতে, মসজিদে যেতে এবং বাড়িতে সুন্দর আচরণের সাথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

আমরা বড়রাও যেন স্মরণে রাখি– আমাদের কল্পনার চেয়েও শিশুদের আকল বা বুদ্ধি অনেক বিস্তৃত ও কৌতূহলপ্রবণ। আমরা তাদের যা প্রদান করি, বলি, বোঝাই– তাদের অনুধাবন শক্তি এর চেয়ে আরও বহুগুণ বেশি। তাই মুসলমান শিশুদের মাথায় এমন কিছু প্রবেশ করানো ঠিক নয়– যেগুলো তাদেরকে চারিত্রিকভাবে লোভী, কঠোর ও আগ্রাসী করে তোলে– যেমন কিছু কার্টুনে দেখানো হয়। হ্যাঁ, ভালো কোনো শিক্ষণীয় বিষয় যদি হয়, সহজেই অনুধাবনযোগ্য হয়– তাহলে চলতে পারে। তবে, সেগুলোও হতে হবে খুবই সতর্কতার সাথে এবং উপযুক্ত পদ্ধতিতে।

আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে। শিশুদের লালন-পালনের নিয়ম-কানুন, দক্ষতা বিষয়ক বইগুলোতে এগুলো পাওয়া যাবে। শিশুদের গল্প-কাহিনির বইগুলোর মধ্যেও পাওয়া যাবে।

মূলকথা হলো, আমরা যদি এমন একটি প্রজন্ম সৃষ্টি করতে পারি– যারা পড়তে ভালোবাসে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ রাখে, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায়– মুসলিম জাতির অবস্থা অচিরেই উন্নতির দিকে ফিরে আসবে। ইনশাআল্লাহ!

১০. চিত্তবিনোদনমূলক পাঠ

আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম পাঠ্যবিষয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে– তাহলে আর এটার কথা বলতাম না। অর্থাৎ এটা হলো, সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেষে চিত্তবিনোদনমূলক পড়া; উদ্দেশ্যমূলক কোনো পড়া নয়।

তবুও এটি পড়ার কথা বলছি কেন?

কারণ, ব্যক্তি মানুষ কর্মে কর্মে একসময় সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার একটু অবকাশ আরাম ও বিশ্রামের প্রয়োজন। এই পড়াটি যেন তেমনই এক বিশ্রাম। তাই, কোনো মুসলিম যদি তার অবসরের কিছু সময় কোনো

বিনোদনমূলক কিংবা আনন্দদায়ক পড়ার মধ্যে কাটায়– এতে কোনো অসুবিধা নেই। সুন্দর কোনো কবিতা পড়তেও নিষেধ নেই। কখনোসখনো একটু-আধটু ক্রিকেট বা এজাতীয় খেলাধুলার খবর রাখতে কিংবা এজাতীয় বিভিন্ন সংবাদ পড়তেও অসুবিধা নেই...।

তবে এসকল ক্ষেত্রে আমাদের অনিবার্যভাবে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল রাখতে হবে :

১. আমাদের এই চিত্তবিনোদনমূলক পাঠেও অনৈসলামিক কিছু পাওয়া যেতে পারবে না। যেমন, আমরা কোনো অশ্লীল রচনা পড়ব না– যা পাপের দিকে উসকে দেয়। যা একটি মেয়েকে তার প্রেমিকের সাথে দেখা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের পরিবার কিছুই জানে না। কেউ কেউ কিংবা কোনো লেখক এটাকে আবার 'পবিত্র ভালোবাসা' নামে তরুণ-তরুণীদের মাঝে প্রচলন ঘটানোর অন্যায় চেষ্টা করে। এটা বর্জনীয়। আবার এমন স্বেচ্ছাচারী অনৈতিক কবিতাও পড়ব না– যার কারণে আমরা গোনাহে লিপ্ত হতে পারি।

২. আমরা এই চিত্তবিনোদনমূলক পড়ায় যে সময় ব্যয় করব, তা খুব বেশি হবে না। কারণ, আমরা এমন এক পরিশ্রমী জাতি, যারা কখনো কখনো একটু বিশ্রাম নেয়। আমরা এমন কোনো ভঙ্গুর ও দুর্বল জাতি নই, যারা ভাগ্যের জোরে কিছুক্ষণ বেঁচে থাকে।

এই হলো দশটি পাঠ্যবিষয়। এগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের পড়াশোনার পথচলা শুরু করতে পারি। এ পথ অতি দীর্ঘ। অতি কষ্টের। তবে এর শেষ অতি সুন্দর। অতি মনোরম। এই পথে রয়েছে– পরম আরামে চোখ বুঝে আসা ক্লান্তি, শেষের শান্তি ...।

হাদিসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

হজরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এমন রাস্তা অবলম্বন করবে, যার মাধ্যমে সে ইলম অন্বেষণ করে; তবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেবেন। [তিরমিজি শরিফ : ৯/২৪৩]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা– তিনি যেন আমাদের ইলম অন্বেষণের রাস্তাকে সহজ করেন। সহজ করেন আমাদের জান্নাতের রাস্তা।

তিনি যেন দীনের ব্যাপারে আমাদের 'ফাকাহাত' দান করেন। আমাদের এমন কিছু শেখান– যা আমাদের উপকার করবে এবং আমরা যা জেনেছি তাও যেন আমাদের উপকার করে।

তিনিই আমাদের তাওফিকদাতা। তিনি সকল কিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ.

অচিরেই তোমরা স্মরণ করবে আমি তোমাদের যা বলি, আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি। [সুরা গাফির : ৪৪]

।। সমাপ্ত ।।